College Form No. 4

This book was taken from the Library on the date last stamped. It is returnable within 14 days.

12.11.59.		
1.12.59		
17.12.59		
4.4.60		
5.3.61		
14.[illegible].61		
26.12.[illegible]		
12.5.64		
18.8.66		
14.9.66		
1.6.67		
25.3.71		

এই আছে, এই নেই তবু তার শরীরেরও চাইতে বড়ো দু'টি পাখা, তাতে আকাশের সাত রঙ, বাতাসের ছায়া, পৃথিবীর শত-সহস্র পুষ্পকোরকে মধুর আমন্ত্রণ। এমনি প্রজাপতি। বসন্তের ক্ষণায়ু অবকাশে আলোয় ভেসে পড়েছে—ক্ষণিকের জীবনবিলাসী সম্রাট;—তারপর, বসন্ত ফুরোয়, পাখা খ'রে পড়ে; তারপর তারা কী হবে, কী করবে? কী হবে বিগতযৌবন শিক্ষক ও শিক্ষিকা, 'বিকেলের রোদে' পরস্পরকে যারা আরেক বার আবিষ্কার ক'রেই হারিয়ে ফেলল; সেই ভিক্ষাব্যবসায়ী বর্বর প্রৌঢ়, দূর বারনারীর চোখে যৌবনের রাজকন্যাকে ঝিকিয়ে উঠতে দেখে যে রক্তের অক্ষম আক্রোশে 'শঙ্খচূড়ে'র বিষে নীল হয়ে গেল?

যৌবন যায়, যৌবন বেদনা তবু যায় না; প্রজাপতির রঙ শেষ হয়, প্রজাপতি হতে না পারার নির্মম অভিশাপ নিয়ে তবু বেঁচে থাকতে হয়। নিয়তি।

এই নিয়তিতাড়িত কয়েকটি নর-নারী এ-গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা। প্রবোধবন্ধু এঁদের চেনেন, হয়তো এঁদের মধ্যে বসবাসও করেন, এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার বিরল সৌভাগ্যে তিনি বলীয়ান, তাই তাঁর হাতে এঁরা যেমন সার্থক সহজতায় উদ্ঘাটিত, তেমন আর হয় নি। এই সহানুভূতি-করুণ প্রেমনম্র কাহিনীগুচ্ছ তাঁকে সাম্প্রতিক সাহিত্যে চিহ্নিত করবে।

প্রজাপতির রঙ্

প্রবোধবন্ধু অধিকারী প্রণীত

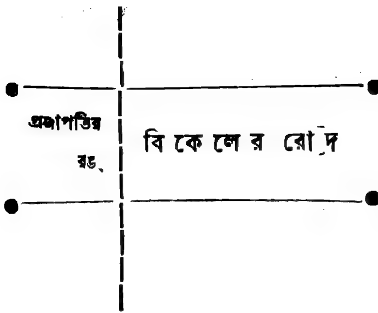
প্রজাপতির রঙ

নিউ স্ক্রিপ্ট প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ। পৌষ, ১৮৮০ শকাব্দ
প্রকাশক : সুচরিতা দাশ
নিউস্ক্রিপ্ট। ১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯
প্রচ্ছদপট : সুবোধ দাশগুপ্ত
মুদ্রক : সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বস্তিক মুদ্রণালয়। ২৭।১বি কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা ৬
ব্লক : রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট। ৭।১ বি কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট মুদ্রক : দি নিউ প্রাইমা প্রেস। ১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা ১৩
বাঁধাই : ইস্টএণ্ড ট্রেডার্স। ২০ কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯

দাম : ২.৫০ টাকা

সূচীপত্র



ম্লান অবিশ্বাসে ভারনত চক্ষু তুলে আবার তাকালেন মহিমানাথ সম্মুখে। দুরন্ত বিস্ময়। অবাক-বিস্ময়ে চোখ দু'টো কুঞ্চিত ক'রে, প্রশস্ত কপালে খাঁজ ফেলে নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেও চেনা যায় না। দৃষ্টিরোধী কুয়াশা-কুণ্ডলীর আবর্তে পশ্চাদ্জীবনের ইতিহাস ম্লান ছায়ার মতো মনে হয়।

আশ্চর্য হন মহিমানাথ। ব্যগ্র হৃদয়ের কোণে জানবার দুরন্ত আকুতি, কিন্তু বিস্ময়ের বেড়াজালে অন্তরীণ স্মৃতি-বিস্মৃতির অবলুপ্তি থেকে মুক্তি পায় না। চেনবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় মনের কোণে আথালি-পাথালি হাতড়াতে থাকেন তিনি।

'মনে পড়ছে না?'

চমকে উঠে বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে একসূত্রে গাঁথতে চেষ্টা করেন মহিমানাথ।

অসংখ্য লোকজনের ভিড় কলকাতার এই এলাকায়। মঙ্গলবারে কালীঘাটের মন্দির-প্রাঙ্গনে অগুনতি পুণ্যার্থীদের ভিড়। মহিমানাথ ঠিক পুণ্য করতে আসেন নি। মন্দিরের কাছাকাছিই তাঁর বাসা। রোজ বিকেলে একটু ঘুরে বেড়াবার পথে মা-কে দর্শন ক'রে যান। বৃদ্ধ বয়সে সম্বল এইটুকুই, ওইটুকুই পাথেয়। দৈনন্দিন জীবনে, সংসারের সমস্যার আবর্তে নিশ্চিন্ত মনে তাঁকে ডাকবার অবসর কোথায়? তবুও দিনে

এই যে একবার দর্শন, একবার তাঁর শ্রীচরণের উদ্দেশে মস্তক নত ক'রে মহিমাময়ী মা-কে স্মরণ, এতেই যেন অনেকটা শান্তি। জটিল সমস্যার সমুদ্রে তাঁর নামটাই একমাত্র অবলম্বন।

'আমি কনক, মাঝেরগাঁয়ের।'

কনক! চমকে উঠলেন মহিমানাথ। ভ্রূ দু'টো অস্বাভাবিক কুঞ্চিত ক'রে সোজাসুজি তাকালেন এ-বার।

আশ্চর্য, চেনা যায় না! এত সহজে কি ক'রেই বা চিনবেন? সে কি আজকের কথা? কিন্তু এই কি সেই কনক—মাঝেরগাঁয়ের কনক চৌধুরী! মাথার চুলে রোদছায়ার সংমিশ্রণ, আশ্চর্য রকমের মেদবহুল হয়ে পড়েছে দেহটা। সেই দুধ-সাদা ধবধবে রঙে সুস্পষ্ট ম্লানিমার ছাপ। খানিকটা কুঁচকে গেছে চাপা-রঙ মুখখানা।

'এ-বার? এ-বার মনে পড়েছে?' আরও খানিকটা কাছে সরে এল কনক চৌধুরী।

পড়েছে। তা আর পড়বে না! মাঝেরগাঁয়ের কনক চৌধুরী, তাকে মনে পড়বে না মহিমানাথের, সেও কি সম্ভব। মনে পড়বেই, পড়তেই হবে। বিস্মৃতির সেই কুয়াশা-কুণ্ডলী দমকা হাওয়ার দাপটে সরে গেল। সরে গিয়ে পুরনো দিনের কনক চৌধুরীকে মনে পড়ল।

'কনক!'

'হ্যাঁ। খুবই কি কষ্ট হচ্ছে চিনতে?'

'না, মানে'—একটু থামলেন মহিমানাথ। 'অনেক দিনের কথা, আর তুমি কেমন যেন বদলে গেছ অনেক।'

'হ্যাঁ, তা গেছি বই কি। বয়স তো আর কম হল না। চুল পেকেছে, দাঁত পড়ব পড়ব করছে।'

'তা ঠিক, তা ঠিক।' সায় দিলেন মহিমানাথ।

'শুধু আমার পরিবর্তনটাই চোখে পড়ল তোমার? তুমি যে কত বদলে গেছ—আমার চেয়েও অনেক।'

কথাটা যেন ভালই শোনাল কনকের মুখে। এমন কথা অনেক দিন

শোনেন নি মহিমানাথ—অনেক কাল। সত্যিই তো, তিনিই কি সেই মহিমানাথ আছেন? গঙ্গাধরপুর হাই স্কুলের গম্ভীর সেই প্রধান শিক্ষক। যাঁর প্রতাপে শুধু ছাত্ররাই নয়, ক্লাস-টিচাররা পর্যন্ত ভয়ে কাঁপত। সেই দীর্ঘাবয়ব, উন্নতনাসা সবল দেহটা সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে সম্মুখের দিকে। মাথার চুলগুলো কাশফুলের মতো আশ্চর্য সাদা। ক্ষীণ হয়ে এসেছে দৃষ্টিশক্তি। কিন্তু আশ্চর্য, ঠিক চিনেছে কনক। গঙ্গাধরপুর স্কুলের মেয়েদের বিভাগের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী কনক চৌধুরী। চিনবে না-ই বা কেন? কত দিনের পরিচয়। কত দিন এক সঙ্গে পাশাপাশি বসে মাথা ঘামিয়েছেন স্কুলের উন্নতির জন্য। সেই কনক, সে চিনবে না মহিমানাথকে, তাও কি হতে পারে।

'এ-দিকে কোথায়?'

'এখানেই।' বললেন মহিমানাথ, 'এই মায়ের বাড়ি। রোজ বিকেলে একবার আসি, দর্শন ক'রে যাই।' কনকের দিকে চোখ তুললেন, বললেন, 'তুমি, তুমিও কি—'

'হ্যাঁ।' বাধা দিল কনক, 'এ-বয়সটাই যে এখানে আসবার।'

'বেশ, বেশ!' হঠাৎ একটু অবাক হলেন মহিমানাথ, বললেন, 'কিন্তু তোমার তো সে-বয়স হয় নি কনক।'

'কী যে বল তুমি! হিসেব কর তো এক বার। মনে ক'রে দেখ তো গঙ্গাধরপুরের কথা।'

কনকের কথার অপেক্ষায় থাকেন নি, অনেক আগে থেকেই ভাবছেন মহিমানাথ। হ্যাঁ, কনককে চিনবার পর থেকেই টুকরো টুকরো সেই সব কাহিনী ছবি হয়ে ভাসছে চোখের সম্মুখে।

কী রূপই না ছিল কনকের! মাঝেরগাঁয়ের চৌধুরীদের মেয়ে, সদ্য বি. এ. ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়েছে। মাস্টারি লাইনে একেবারে আনকোরা। সেক্রেটারি বললেন, 'একটু ঘষে-মেজে নেবেন মহিমবাবু।' তিন-তিনটি বৎসর ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এক রকম হাতে ধরেই শেখালেন মহিমানাথ। চেষ্টা ছিল মেয়েটার, আগ্রহ ছিল শেখবার।

'তারপর আছ কেমন ?'

'ভালই।' বলল কনক, 'আছি ভাগলপুরে। ক'দিনের ছুটিতে কলকাতায় এলাম।'

'করছ কী ?'

'সেই মাস্টারি।' ফস ক'রে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল কনক, 'যা তুমি হাতে ধরে শিখিয়েছিলে এক দিন, যার জন্যে গঙ্গাধরপুর ছাড়তে হয়েছিল আমাকে।'

কনক কি দোষী করছে ! না না। নিজের মনেই ভাবলেন মহিমানাথ। কনক যদি আজ মহিমানাথকেই দোষী করে, বলবার নেই কিছু। সেদিনও ছিল না, যেদিন গঙ্গাধরপুরের মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছিল সে। দোষ তাঁরও ছিল বইকি। না থাকলে তিনিই বা কেন টিঁকতে পারলেন না, সহ্য করতে পারলেন না গঙ্গাধরপুরের জীবন।

স্কুল ছুটি হয়ে যাবার পর লাইব্রেরির টেবিলে মুখোমুখি বসে আলোচনা হয়েছে তাঁদের। অনর্গল ব'লে গিয়েছেন মহিমানাথ। কনক ছিল নির্বাক শ্রোত্রী। গালে হাত দিয়ে, মাথাটা এক দিকে ঝুঁকিয়ে তন্ময় হয়ে শুনত সে। এক-এক দিন রাত হয়ে গিয়েছে অনেক, দারোয়ানের ডাকে সম্বিৎ ফিরেছে। তারপর এক সঙ্গে দু'জনে বেরিয়ে পাশাপাশি চলেছেন।

কত আর বয়স ছিল তখন ? বছর বত্রিশ। সুদীর্ঘ বলীয়ান দেহটা সকলের চেয়ে লম্বায় উঁচু। দেখতে সুপুরুষ। মনে দুর্বলতা আসবার বয়সই তো গিয়েছে তখন। অবিবাহিত ছিলেন। দুর্বলতা আসাটা এমন অস্বাভাবিক ছিল না। মাঝে মাঝেই প্রজাপতির বিচিত্র রঙিন ডানার মতো মনের পর্দায় রঙের ঢেউ লাগত। কিন্তু আশ্চর্য সংযমে চেপে রাখতেন নিজেকে। ভুলেও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন না কোনো সময়।

লাইব্রেরি-ঘরে আলোচনায় বসে অনেক দিন লক্ষ্য করেছেন মহিমানাথ, কনক শুনছে না কিছু। হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে। এক ছিটে আলোর ঔজ্জ্বল্য ম্লান মনে হয়েছে সে-দৃষ্টির

কাছে। এ-ও একটা নেশা। সেই নেশাই যেন গ্রাস করতে চাইল তাঁকে। মাঝে মাঝেই আনমনা হয়ে যেতেন মহিমানাথ। মুখোমুখি-বসা দু'টি নরনারীর আদিম দৃষ্টি সংঘর্ষ বাধাত। আর সেই সহস্র সংঘর্ষে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠত মনের অতলে।

'খুব ভাল আছ ব'লে তো মনে হচ্ছে না।' বলল কনক।

'আর ভাল!' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মহিমানাথ, 'এই বয়সে কি ভাল থাকার কথা কনক? কোনো রকমে দিন কাটছে। আর ক'দিনই বা বাঁচব!' যেন আয়ু সম্পর্কে অনেক নিরাশ হয়ে পড়েছেন তিনি।

'কী যে বল তুমি!' অভিযোগ করল কনক, 'ঠিক আগের স্বভাবটাই এখনও রয়েছে। অত দুর্বল হয়ে পড় কেন?'

'দুর্বল!' ম্লান হাসলেন মহিমানাথ, 'এই বয়সটাই বড় দুর্বল ক'রে দেয়। এখন তো জীবন চলছে ভাঁটার টানে, জোয়ারের হাওয়া লাগবে কোথা থেকে?'

'তোমার কথাই ওই রকম।' বলল কনক, 'চুল সাদা হয়েছে ব'লে বুড়ো সাজতে চাও বুঝি? আসলে কিন্তু বুড়ো হও নি তুমি।'

'তোমার দৃষ্টি দেখছি বদলায় নি কনক।' রসিকতা করলেন মহিমানাথ।

'কী ক'রে বদলাবে বল? আসলে তুমি সেই গঙ্গাধরপুরের হেডমাস্টার যে, অন্য চোখে দেখব কি ক'রে?'

ঠিকই বলেছে কনক। আসলে কনকের কাছে ওই সম্পর্কটাই বড়।

কী দিনগুলোই না গিয়েছে গঙ্গাধরপুরের সেই ঝরঝরে জীবনে। সেক্রেটারি এক জন ছিলেন অবশ্য, কিন্তু সে শুধু নামে মাত্র। সমস্ত ক্ষমতা, চাবিকাঠি সবই এই মহিমানাথ। তাঁর কথার নড়চড় করবে এমন একটা কেউ ছিল না। আর ওই স্কুলের জন্য কী প্রাণপাত পরিশ্রমই না করেছেন তিনি। মাত্র কয়েকটা বৎসরের ব্যবধানে সমস্ত জেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল গঙ্গাধরপুর হাই স্কুল। নিজের হাতে গড়া সেই স্কুল শেষ পর্যন্ত ছেড়ে এলেন তিনি। অসহ্য হয়ে উঠেছিল সেই পরিবেশ।

,কলকাতায় কত দিন?' প্রশ্ন করল কনক।

'সে অনেক দিন।' থামলেন মহিমানাথ, 'তুমি চলে আসবার কিছু দিন পরেই।'

চুপ ক'রে গেল কনক। বুঝতে পারল সুযোগ বুঝে একটা আঘাত দিতে ছাড়ল না মহিমানাথ।

বিকেল নেমেছে গাঢ় হয়ে। এক পা, দু'পা ক'রে কথা বলতে বলতে কালী টেম্পল রোড ধরে হাঁটছিলেন মহিমানাথ আর কনক চৌধুরী। ঠিক যেন স্কুল ছুটির পর গঙ্গধরপুরের রাস্তা ধরে এগুচ্ছেন জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে। সেই পাশাপাশি, কাছাকাছি। চোখ তুলে কনকের দিকে আবার ভাল ক'রে তাকালেন মহিমানাথ। কনক যেন অনেক ভারী হয়ে পড়েছে। বিকেলের আলোয় তার দেহে আগেকার সেই প্রভাতী-সজীবতা বিলুপ্ত। সেখানে থইথই করছে অপরাহ্নের ক্লান্ত বিষণ্ণতা।

'এ-দিকে কোথায়?' বললেন মহিমানাথ।

'এই বাস-স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত।' হাঁটতে হাঁটতে কনক বলল, 'জরুরী তাড়া আছে তোমার?'

'কেন?'

'চল, ওই পার্কটায় একটু বসি। আর হয় তো দেখা হবে না। কাল সকালেই চলে যাব।'

'উঠেছ কোথায়?' প্রশ্ন করলেন মহিমানাথ।

'শ্যামবাজারে এক ছাত্রীর ওখানে। সাতটার মধ্যেই ফিরতে হবে। ওরা যুক্তি করেছে আজ আমাকে থিয়েটার দেখাবে। বল তো, এ-বয়সে কি ও-সব ভাল লাগে?'

'নাই বা লাগল। ওরা ধরেছে যখন, যাও; একবার দেখে এস। তোমারই ছাত্রী তো?'

'হ্যাঁ, আমারই ছাত্রী। আমিও কারও ছাত্রীই ছিলাম এক দিন।'

পার্কে খালি বেঞ্চ মিলল না। সবুজ ঘাসের আস্তরণে আঁচল

বিছাতে বিছাতে কনক বলল, 'এখানেও স্থানাভাব। বসো। এখানে একটু বসা যাক।'

দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছিলেন মহিমানাথ। কনকের পাশে বসতে কেন যেন বাধ-বাধ লাগছিল। এমন ক'রে বসবার বয়স অনেক পেছনে সরে গিয়েছে। তখন কত দিন এমন ক'রে পাশাপাশি বসেছেন তাঁরা। কাছা-কাছি। আশ্চর্য, তখন কিন্তু এত বাধ-বাধ লাগে নি।

'বসো, এমন কিছু অস্পৃশ্য অশুচি নই, আগেকার কনকই আছি আমি।'

'না না, সে-কথা নয়, কনক।' লাঠিটা পাশে রেখে স্পর্শ বাঁচিয়ে বসতে গেলেন মহিমানাথ।

কিন্তু বসতেই গায়ে গা লাগছে, ছোঁয়াছুঁয়ি হচ্ছে। একটা ম্লান শিহরণের মতো মনে হচ্ছে যেন! ঠিক হয়ে বসতে গিয়েই আর একবার স্পর্শটা নিবিড়ভাবে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য! স্পর্শের জাদুতে আগের জীবনের সেই আবেশ কোথায়! সেই আবেগ, উত্তাপ? সেদিনের তুলনায় অনেক ম্লান, অনেক শীতল যেন এখন।

'লাঠিটা আবার কেন?' মুখ তুলল কনক।

কথাটা শুনে একটু হাসলেন মহিমানাথ, বললেন, 'অন্ততঃ নির্ভরের জন্যে। বৃদ্ধ বয়সের একটা নির্ভর তো চাই কনক, তাই এই লাঠিটাই আমার ভার বহন করে। এ-টাই সহায় আমার, সম্বল।'

'আমারও একটা লাঠির প্রয়োজন কিন্তু।' মুখ টিপে হাসল কনক।

'কেন!' বিস্মিত চোখে কনকের দিকে তাকালেন মহিমানাথ।

'বয়স আমারই কি কিছু কম হল?'

'এই দেখ, ছেলেমানুষিটা তোমার একটুও কিন্তু কমে নি কনক।'

'তুমিই তো বললে, বয়স হয় নি আমার।'

'হ্যাঁ, মানে, আমার তুলনায় তুমি তো—'

'যুবতী, না?' ডাগর চোখ তুলে মহিমানাথের দিকে তাকাল কনক: 'দেখ, লাঠি নিয়ে গুটি-গুটি চলবার মতো বয়স তোমার হয় নি। বুড়ো হয়ে গেছ এ-চিন্তাটা ছাড় তো।'

চুপ ক'রে গেলেন মহিমানাথ। কয়েকটা পল ক্ষণ গড়িয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে কনকই কথা বলল, 'করছ কি এখন ?'

'সেই মাস্টারি।'

'মাস্টারি !'

'হ্যাঁ।'

প্রথম কলকাতা এসে স্থির করেছিলেন মহিমানাথ, ও-পথে আর নয়। করপোরেশনে একটা ভাল চাকরি পেয়ে গেলেন। কিন্তু কিছু দিন পর নিজের ভুলটা ধরা পড়ল। মনে হল, পৃথিবীতে বাঁচতে হলে মাস্টারি করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই তাঁর। সারা জীবন ধরে অজস্র নিবন্ত প্রদীপে আলোর শিখা জ্বালাবেন তিনি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তার অস্থি-মজ্জার অণুতে অণুতে বোধ হয় ওই একটা কথাই জীবন্ত হয়ে রয়েছে—মাস্টারি, শিক্ষকতা।

'আবার সেই মাস্টারি ?'

'ছেড়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না কনক। দেখলাম, ছেড়ে দেবার জ্বালার চাইতে না-ছাড়বার যন্ত্রণা অনেক কম। তা ছাড়া—'

'থাক্।' বাধা দিল কনক, 'আর একটা কথা বল তো, কি ক'রে ছেড়ে আসতে পারলে গঙ্গাধরপুর ?'

'জ্বালায়।' বললেন মহিমানাথ, 'জ্বালায় ছাড়তে হল কনক। তুমিও তো এক দিন না ব'লে, না ক'য়ে—'

'ছাড়তে হয়েছিল।' মুখ নিচু ক'রে বলল কনক, 'ইচ্ছা ছিল না। অনেক যুদ্ধ করেছিলাম মনের সঙ্গে। কিন্তু তোমাকে আমি কোনো দিনই ছোট করতে চাই নি।' বেশ ভারী আর্দ্র মনে হল কনকের কণ্ঠ।

বেশ মনে পড়ছে, স্পষ্টতর হয়ে ভাসছে সেই ছবি।

কিছু দিন থেকে কনককে বেশ চিন্তিত মনে হত। আর একটা আশ্চর্য পরিবর্তনও লক্ষ্য করেছিলেন মহিমানাথ। কনক তার আবদার, দাবি আর শাসনে বেঁধে রাখতে চাইত মহিমানাথকে। খাওয়া-পরা নিয়ে শাসন, স্বাস্থ্য

নিয়ে সাবধান করা—এ-সব লক্ষণগুলো ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠল। আর তার প্রমাণ মিলল কিছু দিনের মধ্যেই।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় দিন কয়েক বিছানায় পড়েছিলেন মহিমানাথ। বাসায় একটি মাত্র চাকর ভিন্ন আর কেউ নেই। খবর পেয়ে স্কুল ছুটির পর ছুটে এল কনক। সে তার অন্তরূপ! ঘর গোছাতে গোছাতে নোঙরা স্বভাবের নিন্দা, খাওয়া-শোওয়া নিয়ে সাবধান, তারপর নিজের হাতে পথ্য রেঁধে খাওয়ানো।

এ-সব ক'রে মাথার কাছে বসে মহিমনাথের রুক্ষ আতেলা চুলে হাত বুলোতে লাগল। দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেল। মহিমনাথ যেতে বললেন কনককে, বললেন, 'এ-বার তোমার যাওয়া উচিত কনক।'

কনক কিন্তু সে-কথার জবাব দিল না। আস্তে ক'রে বলল, একটা কথা রাখবে আমার?'

'কী?' চোখ বুজে বললেন মহিমানাথ।

'এ-বার একটা বিয়ে কর। একলা ঘরে কখন মরে পড়ে থাকবে, কেউ দেখবে না।'

মহিমানাথ নিরুত্তর।

কনক হাত বুলোচ্ছে মাথায়। একটা চমৎকার আবেশ, মধুর স্পর্শানুভব। চোখ বুজে অনেক কথাই ভাবছিলেন মহিমানাথ।

'শুনছ?' আবার ডাকল কনক।

'অ্যাঁ!' যেন আগের কথাগুলো কানে যায় নি মহিমানাথের।

'শরীরের যা গতিক, একটা বিয়ে কর।'

'বিয়ে!' যেন আকাশ থেকে পড়লেন মহিমানাথ। হাতটা তুলে নিজের উষ্ণ কপালে রাখতে গেলেন। হাতে হাত মিলে গেল। কনকের হাতটা মহিমানাথের মুঠোয় থরথর ক'রে কাঁপছিল।

'এ-বার যাও,' মহিমানাথের গলা কাঁপছে।

'না।'

'কিন্তু সে-টা ভাল হবে না কনক।'

'কারও ভাল-মন্দের ধার আমি ধারি না। আমার ইচ্ছাটাই আমার কাছে বড় কথা।'

সেই কনক না জানিয়ে, না বলে-কয়ে চলে গেল এক দিন। দিন দু'য়েক পরে রাস্তা থেকে লেখা তার একটা চিঠি এল তারিখ-ঠিকানা-বিহীন। কনক লিখেছে, "শুধু গুঞ্জরণের জন্য নয়, নিজেও ভেবে দেখলাম। যাদের কাছে এক দিন খ্যাতির শীর্ষে ছিলে তুমি, আমার জন্যই কত নিচে আজ নামতে হয়েছে তোমাকে। তোমার গৌরবের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে কোনো দিনই চাই নি আমি, কিন্তু দেখলাম অজান্তেই ভুল পথে এগিয়ে গিয়েছি আমরা। কিন্তু আর নয়, তাই সরে এলাম। ক্ষমা কর।"

সত্যিই ভাবতে পারেন নি, এমন ক'রে আঘাত পেতে হবে কনকের কাছ থেকে। গুঞ্জরণের আর দোষ কী। সহকর্মী হলেও আসল সম্পর্কটা শিক্ষক-ছাত্রীর। কিন্তু সেই সম্পর্কের আড়ালে অত ঘনিষ্ঠতা কেন, কেন অত অন্তরঙ্গতা? কথাটা শুনেছিলেন তিনিও। সেক্রেটারি বলেছিলেন। কিন্তু গা করেন নি মহিমানাথ।

নড়েচড়ে বসল কনক। স্পর্শটা আবার গভীর ভাবে ছোঁয়া দিল। কেমন একটা শিহরণ শীতলতম বরফকণার মতো বিঁধল। মুখের দিকে তাকাল কনক, বলল, 'একটা কথা বলব। বল, লুকোবে না?'

'না না, লুকোব কেন?'

'রোজ মন্দিরে মাথা খুঁড়ে কী চাও তুমি, সত্যি ক'রে বল তো?'

একটু হাসলেন মহিমানাথ, বললেন, 'কী আর চাইব কনক, এ-বয়সে কি চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্ন আসে? তবু আসি। প্রণাম করি। ওইটুকুই শান্তি।'

'উঁহু।' মাথা ঝাঁকাল কনক, একটু হেসে বলল, 'সব লুকোচ্ছ।'

'এই দেখ! বয়স বাড়ল, কিন্তু ঠিক আগের ছেলেমানুষটিই আছ তুমি।'

'লাঠি হাতে নিলেও বুড়ো তুমি মোটেই হও নি।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল কনক।

শব্দ ক'রে হাসলেন মহিমানাথ, বললেন, 'লুকোছাপির কথাই যখন তুললে, তা হলে আমিও একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। মাথায় সিঁদুর নেই কেন কনক?'

আচমকা যেন একটা চড় খেয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল কনকের মুখ। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তোলা সিঁদুর নিজের ভুলে ধুলোয় ছড়িয়ে গেছে।' একরাশ কান্না ছড়িয়েও মুখ বন্ধ করল না কনক। বলল, 'তুমিই বা বিয়ে কর নি কেন, শুনি?'

ভাষা জোগাল না মুখে। যেন প্রচণ্ডতম একটা আঘাতে বোবা হয়ে গেছেন মহিমানাথ।

রাত হয়ে গেছে। নানা রঙের আলো জ্বলছে দোকানে দোকানে। সাঁ-সাঁ ক'রে রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে ট্যাক্সি, বাস আর ট্রামগুলো। ট্রাম-লাইনের দু'পাশের গাছগুলোর নিচে থোকা থোকা আবছা অন্ধকার। লাঠি ঠুকে ঠুকে রাস্তা পার হলেন মহিমানাথ। ভাবলেন, বরং ব্যথাই পেত কনক, যদি শুনত সত্যিই বিয়ে করেছেন তিনি।

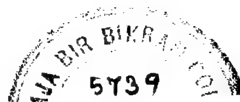
শেষ বয়সে বাসন্তী এসে জুটল। সেও মহিমানাথেরই ছাত্রী। নড়ল না, কথা শুনল না, শেষ বয়সে মহিমানাথের সেবা করার অধিকার চেয়েছিল বাসন্তী। না দিয়ে পারেন নি। একটু কনকের মতো দেখতে হলে কি হবে, ওদের দু'জনের মধ্যে আশ্চর্য তফাত।

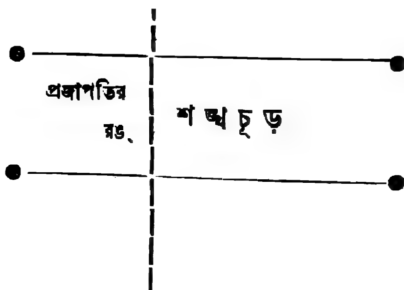
বাসায় ফিরবার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসবে বাসন্তী। হাত ধরে ঘরে নিয়ে বসাবে। তারপর জামার বোতামগুলো খুলে দিতে দিতে বলবে, 'কোথায় ছিলে এত রাত অবধি! আমি তো ভয়েই মরি। বুড়োমানুষ কখন কি হয় বলা তো যায় না!'

বুড়োমানুষ! থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন মহিমানাথ। কনকের ধারণাটা কিন্তু ঠিক উলটো। সে বলল, 'লাঠি হাতে নিলে কি হবে, আসলে মোটেই বুড়ো হও নি তুমি।'

হঠাৎ মনে হল, ঠিকই বলেছে কনক। বয়স তো ওরও হয়েছে, কিন্তু

হাসলে এখনও বেশ দেখায় কনককে। আর আমি? কী এমন বয়স হয়েছে আমার? সবে তো পঞ্চাশ পেরোলাম। তা হলে···লাঠিটা তুললেন মহিমানাথ। এই তো, এই তো বেশ চলতে পারছেন তিনি। পা পা ক'রে সন্তর্পণে গুটি-গুটি এগুলেন মহিমানাথ। আসলে কনকের কথাটাই ঠিক। বুড়ো মনে করলেই, বুড়ো।





ঠিক হ্যারিসন রোড-চিৎপুর জংশন থেকে শব্দটা উঠল। নিশুতি রাত্রির মধ্য প্রহরকে সচকিত ক'রে শব্দটা এগুল।

কাতর আর্তনাদের মতো শব্দ তুলে শেষ ট্রামটা রাত্রির মতো বিদায় নিল, তারপর এ-এলাকাটা নিস্তব্ধ নিঃসাড়। দু'টো একটা পান-বিড়ির দোকান ছাড়া আর সব বন্ধ। রাস্তাটা নির্জন। সেই নির্জন মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতাকে সজাগ ক'রে শব্দটা হ্যারিসন রোড ধরে বরাবর এগুল সেণ্ট্রাল এভেন্যুর দিকে।

ডাইনে বায়ে সর্পিল ছোট ছোট অলি-গলি। ডান বগলের তলায় ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে ইয়াসিন মিঞা। বাঁ-পা আর ওই ক্রাচটা সম্বল। হাঁটবার সময় ডানদিকে ঝুলে পড়ে ন্যুব্জ দেহটা। থরথর কাঁপন ওঠে সমস্ত শরীর জুড়ে। কিন্তু তবুও বিকল দেহটাকে টেনেটুনে এগোয়।

বরাবর হ্যারিসন রোড ধরে এগিয়ে এসে সেণ্ট্রাল এভেন্যুর জংশনে থামল শব্দটা। ক্রাচে ভর দিয়ে তাল রেখে দু'টো বাহু দু'দিকে প্রসারিত ক'রে আরমোড়া ভাঙ্গল ইয়াসিন। তারপর রাস্তার ওপর বসা পঙ্গু মেয়েটাকে গুঁতো মারল ক্রাচটা দিয়ে।

মেয়েটা ঝিমুচ্ছিল। আচমকা ঠেলা খেয়ে নাকি সুর ক'রে ব'লে উঠল, দ্যান বাবা, একটা পয়সা দ্যান, আজ তিন দিন…'

'শয়তান !' দাঁতে দাঁত ঘষে চাপা কণ্ঠে গর্জে উঠল ইয়াসিন।

নিদ্রালস একজোড়া চক্ষু অবাক-বিস্ময়ে স্থির হল। চোখের নীল ডিম দু'টো অস্বাভাবিক ভাবে কেঁপে উঠল, শিউরে উঠল আতঙ্কে। মুহূর্তমাত্র দেরি না ক'রে উঠে দাঁড়াল পঙ্গু মেয়েটা। বিবর্ণ তেলচিটে কাপড়ের ভাঁজ ট্যাঁক হাতিয়ে এক মুঠো পয়সা মেলে ধরল ইয়াসিনের সম্মুখে। নৃশংস ভুজঙ্গের কুটীল ফণার ওপর এক ফোঁটা বশীকরণ ওষুধ।

সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটার হাত থেকে ছোঁ মেরে পয়সাগুলো কেড়ে নিল ইয়াসিন। প্রাণপণে হাতের মুঠোটা চেপে ধরল। বদ্ধমুষ্টির মধ্যে ঘষা, আধঘষা তামার পয়সাগুলো কেঁদে-ককিয়ে উঠলো তীব্র ঘর্ষণে। তারপর মুঠোটা মেলে ধরল রাস্তার বিজলী বাতির আলোর সম্মুখে।

আর কোনো কথা নয়। আবার শব্দটা উঠল। নিস্তব্ধ রাত্রির মধ্যপ্রহরে সরু অপরিসর সর্পিল গলিপথে ইয়াসিন মিঞা এগিয়ে চলল ক্রাচে শব্দ তুলে—ঠক্···ঠক্···ঠক্। পেছন পেছন সাত বছরের মেয়েটা। যাকে এই কয়েক ঘণ্টা আগেও পথচারীর দল পঙ্গু ভ্রমে করুণা ক'রে গেছেন দু'টো একটা তামার পয়সার দাক্ষিণ্যে।

'ইয়াসিন মিঞা না ?'

'হ।' ঠক্ ক'রে একটা শব্দ হল ক্রাচের। বার দুই ঝাঁকি দিয়ে ঝুঁকি সামলে ফিরে দাঁড়াল ইয়াসিন।

অপরিসর গলির বাই-লেনের মুখে গ্যাসলাইটের স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে আলতাফ। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রাস্তার ওপারের বস্তীর একটি নির্দিষ্ট কক্ষের দিকে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে। সুরা-লাল চোখ দু'টো ঘুরপাক খাচ্ছে অভুক্ত কুত্তার মতো। সে-দিকে চোখ রেখেই আলতাফ বলল, 'এত রাইত হইল আইজ !'

'আর কও ক্যান। রাইত না হইলে তোমাগো যেমুন জমে না, আমাগোও তাই। কইলকাতার মাইনষের তো রাইতেই দিল খুশ্ থাহে। শুনলাম ঢাহায় গেছিলা, আইলা কবে ?'

'কাইল।' রাস্তার ওপারের সেই নির্দিষ্ট কক্ষের দিকে তাকাল আলতাফ।

ইয়াসিনও দেখল। দেখল, বাঁশ-বাখারির ছোট্ট একটু গবাক্ষ। একটা মূর্তি নড়ছে সেখানে। নড়ে নড়ে স্পষ্ট হল মূর্তিটা। আর তাকাল না ইয়াসিন, বলল, 'যাই।'

'আরে রও রও মিঞা, ঘরে যাইবার তাড়া কিয়ের লাইগ্যা।'

আলতাকের দৃষ্টি সেই ছোট্ট গবাক্ষে আবদ্ধ। সুরা-লাল শ্বাপদ-চোখের লোলুপ তারা দু'টো ঘুরপাক খাচ্ছে বুভুক্ষার হিংস্র তৃষ্ণায়। শ্যেন দৃষ্টিতে শকুনির মতো তাকিয়ে আছে পণ্যাঙ্গনার গবাক্ষ-পথে।

'আল্লা আল্লা!' আর দাঁড়াল না ইয়াসিন মিঞা, এগিয়ে চলল সম্মুখে। নোওড়া গলির ম্লান আলোয় সঙ্গের ছদ্মবেশী পঙ্গু বাচ্চাটার দিকে তাকাল, তারপর ন্যুব্জ দেহটা দুলিয়ে ডান পাশে ঝুঁকে ক্রাচে শব্দ তুলল—খট্‌···খট্‌···খট্‌।

পৃথিবীটা বড় পরিবর্তনশীল। ঢাকার সেই স্বচ্ছল জীবনযাত্রার ল্যাণ্ডস্কেপের একটা টুকরো মনে পড়ল। হাওয়ায়-ওড়া সেই মুক্ত ঝলমল জীবন।

গেণ্ডারিয়ায় ঘাঁটী ছিল। টমটম চালাত ইয়াসিন মিঞা। রোম-ওঠা পাঁজর-প্রকট ঘোড়া দু'টো বাক-চাতুর্যে পক্ষীরাজ বনত। শুধুই কি কিরায়া খাটা? তাতে আর পয়সা আসত ক'টা। আসলে ও-কাজটা ছিল পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়ার কৌশল। কিরায়ার পয়সায় রাত্রের লাল-পানির তৃষ্ণাও মিটত না। তাই আসল একটা ব্যবসা ছিল সদর ঘাটের কাছাকাছি। ইয়াসিন মিঞা সে-দলের সর্দার, ওস্তাদ।

সন্ধ্যা নাগাদ কিরায়া নিয়ে সেই যে স্টেশন থেকে বেরিয়ে যেত, গেণ্ডারিয়া স্টেশনে আর দেখা যেত না তাকে। সদর ঘাটের আড্ডায় পেটে সুরার স্পর্শে ইয়াসিন মিঞা তখন দুনিয়ার বাদশা। অন্তত ঢাকা শহরের তো বটেই। রাত যখন ঘণ্টার কাঁটা আর মিনিটের কাঁটায় এক হয়ে যেত,

দূরের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে উঠত বারোটার সময়-সঙ্কেত, তখন বসত সারা দিনের সাকরেদদের কামাইয়ের ভাগাভাগি।

গুণ্ডামী, রাহাজানি আর গাঁটকাটার কাঁচা পয়সা। দু'টো চারটে ঘড়ি কলম মনিব্যাগ, মেয়েদের গায়ের অলঙ্কার আর সেই সঙ্গে দু'একটা ছুটকো-ছাটকা বসরাই গোলাপ। সরাইখানার এক রাত্রির অতিথি ওরা। খুব সুলভ না হলেও খুব দুর্লভও নয়। হিংস্র পাশব-আক্রোশে বসরাই গোলাপের পাপড়িগুলো একটা রাত্রির সীমিত সময়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলত ইয়াসিন মিঞা, তারপর ভুক্তাবশিষ্টের মতো দলের সাকরেদদের দিকে ছুঁড়ে দিত।

ঠিক বসরাই গোলাপ। রাতের পাওনা গণ্ডার হিসাব কিতাব চুকিয়ে ঘরে ফিরছিল ইয়াসিন। রেবতী দাস রোডের মোড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। হ্যাঁ, ভুল দেখে নি ইয়াসিন মিঞা। মধ্যরাত্রির নির্জন রাস্তায় নক্ষত্রের দ্যুতি ছড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে একটি মেয়ে। রাস্তার ম্লান আলোয় বিজলীর মতো চকচক করছে তার গায়ের গহনা।

চোখের ডিম দু'টো ধ্বক্ ক'রে জ্বলে উঠল ইয়াসিনের। তারপর একটা মুহূর্ত মাত্র। মুখে রুমাল গোঁজা অচৈতন্য দেহটা নেতিয়ে পড়ল গায়ের ওপর। ত্বরিতে গলার হারটা খুলতে গিয়ে চমকে উঠল ইয়াসিন, 'ইনসাল্লা!'

একটা হোঁচট খেতে খেতে দাঁড়িয়ে গেল ইয়াসিন। সঙ্গের বাচ্চাটা পড়ে গিয়ে ককিয়ে উঠেছে। কাঁদছে। ক্রাচটা দিয়ে একটা গুঁতো মারল ইয়াসিন, 'ওঠ শয়তানের ছাও। রাইতের বেলা পথ দেইখ্যা চইলবার পারস্ না।'

কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। দু'হাতের তালু দিয়ে ভেজা চোখ দু'টো কচলাতে কচলাতে বলল, 'খামু।'

'খাবি!' গর্জে উঠল ইয়াসিন 'হালার বেটী! সারা দিনে

পয়সা কামাইচস্ ছয় আনা, আবার খাইবার চাস্! আয়, তরে আমি জন্মের মতন খাওয়ামু আইজ; বেইমানের ছাও।'

হিংস্র দু'টো শ্বাপদ-চোখের বিজলীতে ভড়কে গেল মেয়েটা। বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা কাঁপা কাঁপা কান্নার গমক কণ্ঠের পরিধির মধ্যে বরফ-শীতল হয়ে গেল। নিঃশব্দে সে অনুসরণ করল ক্রাচে ভর করা লোকটাকে। পায়ে পায়ে।

কয়েকটা পল ক্ষণের ব্যবধানে ক্রাচ-নির্ভর ইয়াসিন মিঞা দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। ঝাপবন্ধ খাবারের দোকানটার আলো নিভল। করুণ দৃষ্টিতে সে দিকে তাকাল বাচ্চাটা। ইয়াসিনও দেখল কিন্তু কথা বলল না। অভুক্ত লোলুপ দু'জোড়া দৃষ্টির সমুখ থেকে শেষ আশার আলোটা মিলিয়ে গেল, নিভে গেল সমস্ত রাত্রির মত। কিন্তু নিরঙ্কুশ উপবাসের সত্যটা বড় মনে হ'ল না। ততক্ষণে ট্যাঁকে ছ' আনা পয়সার সজাগ অস্তিত্বের উত্তাপ জ্বালা ধরিয়েছে দেহে মনে।

এলোমেলো বাওর-ঘূর্ণি সূক্ষ্মতম অভীপ্সা তচনচ ক'রে দিচ্ছে সব। রক্তের অণুতে অণুতে অজানিত বাইন-চক্র শিহরণ পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে আশ্চর্য রোমাঞ্চে। বুড়া ছাইতান গাছের বিবর্ণ দেহের মত দাঁদ-জর্জর দেহটার ভাঁজে ভাঁজে বহ্নিশিখার ছোঁক ছোঁক তপ্ত স্পর্শ। বাখারি-জানলার পাশ-ঘেঁষা, সদ্য-দেখা একটা সুপুষ্ট দেহের আশ্চর্য স্বপ্নিল সম্ভাবনা দেহের সমস্ত সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে ছত্রখান করে দিচ্ছে।

নাঃ, মাথা ঝাঁকাল ইয়াসিন। আল্লাহ্ তায়ালা, খোদা বন্দেজ, আমারে বাঁচাও। জোরে এগিয়ে চলল ইয়াসিন। সমুখের দিকে ন্যুব্জ দেহটা ঝুঁকিয়ে প্রাণপণে ছুটতে চেষ্টা করল। 'খোদা কসম, জীবনে আর গুণাহ্ করুম না।'

•

হাজার টাকার স্বর্ণ-উজ্জ্বল সেই লাউডগা-নরম দেহটা কি প্রশান্তিই না দিয়েছিল! মনে-প্রাণে ছুঁইয়েছিল মুক্তার পরশ। তড়িৎচঞ্চলা

হরিণী। সুপুষ্ট দেহের পরতে পরতে অকৃপণ যৌবনের রোমাঞ্চ। বিলের টলটলে পানির অতলে শুক্তিবদ্ধ মুক্তার সঞ্চয়।

আমিনা। আমিনা খাতুন। সদর ঘাটের কারবারী জাহেদ ব্যাপারীর বিবিজান। ইয়াসিনকে খায়-খাতির করত জাহেদ আলী। টমটমে দোকানের মাল আনা-নেওয়া, তা থেকে বাল-বাচ্চা আর আব্রু-আড়ালের বিবিজানকে। সেই থেকে জাহেদ আলীর বাঁধা কিরায়াদার আর ঝগড়া-কাইজ্যার সহায়।

সময়ে অসময়ে জাহেদ আলীর অনুপস্থিতিতেও আসতে হ'ত। পাঠাত জাহেদ আলী। বিবিজানের শখ আছে। টকী-বাইস্কোপ দেখবার, বেড়াবার বিচিত্র শখ। চলন্ত টমটমে বসে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষতে কষতে পাশব আক্রোশে পেশীগুলো মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠত ইয়াসিনের। একটা মাত্র বাধা। জাহেদ আলীর আগের পক্ষের চৌদ্দ বছরের পোলাডা। ওটাই সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

আসমানের বিজলী ব'লে ভুল হয়েছিল ইয়াসিনের, প্রথম যেদিন সে দেখতে পেয়েছিল বিবিজানকে। কিরায়া ফেরত ডাকল জাহেদ আলী, বলল, 'যাইতাচ যখন একটা কাম কইরা দিয়া যাইও মিঞা। ঘরের থনে নাস্তাডা দিয়া যাইও আমারে, আর কইও, মাল খালাস কইরা যাইতে রাইত হইব আমার।'

সেই নাস্তা নিতে এসে সদ্যস্নাত আসমানের পরী দেখল ইয়াসিন। বে-আব্রু গোছলখানা থেকে এক চিলতা গামছার আবরণে ঢাকা আশ্চর্য একটা স্বপ্নিল দেহ। পদ্মবিলের অতল থেকে উঠে-আসা সিক্ত পদ্মবতী। দু'চোখের ডিম দু'টো নিশ্চল পাথর-শক্ত হয়ে গেল এক লহমায় বিস্ফারিত দু'চোখের কেন্দ্রে। আর একটা মাত্র মুহূর্তের ব্যবধানে ঝড় বয়ে গেল। পদ্মরাগমণির দ্যুতি ছড়িয়ে অপরিসর একটা ঘরের পরিধির মধ্যে বন্দিনী হল অপ্রস্তুত সেই অপরূপা।

তারপরই বেরিয়ে এল জাহেদ ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের ছেলে মকবুল। সে-ই সব ব্যবস্থা করল। নাস্তা নিয়ে ফিরে এল ইয়াসিন, কিন্তু তার

চোখের নীল ডিম দু'টো থেকে সেই পদ্মকন্যার স্বপ্নিল দেহটা মুছল না। গোলাপ কাঁটার যন্ত্রণা হয়ে বিঁধে রইল।

জাহেদ ব্যাপারী অকপট বিশ্বাস করেছিল ইয়াসিনকে। আব্রু-আড়াল অন্দরমহলে পর্যন্ত যাবার অধিকার দিয়েছিল। দেবে না-ই বা কেন? ঝগড়া-কাইজায় ইয়াসিন মিঞার মত মিতা জুটবে কোথায়? একমাত্র ভয় বিবিজানের জন্য। কিন্তু কলমা-পড়া নিকা-সাদি করা বিবি নয়। জান-পয়চান গৌরপুরের ছোট ব্যাপারীর বিবি। পাওনা ফাঁকি দিয়েছিল ছোট ব্যাপারী আর তার পরিবর্তে অদ্ভুত প্রতিশোধ নিয়েছে জাহেদ আলী। ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছে বিবিকে। আশ্চর্য সুন্দর। কাঁচি মদের নেশার মত বিবিজানের পদ্মিনী রূপ উন্মাদ করেছিল জাহেদ আলীকে। এমন বিবি না হলে ঘর মানায়? আগেরটা মারা গেছে বছর কয়েক আগে, তারপর থেকে এই ক' বছরের ফারাকে মনটা উথল-পাথল করছিল। কিন্তু সুমুন্দির বেটী বড় বেজাত। বজ্জাত। শুধুই ফূর্তি করতে চায়, সেজে-গুজে থাকতে চায়। বুড়ো ব'লে আমল দিতে চায় না। তাই ব'লে বেহুশ বেআদপ নয় জাহেদ আলী। আগের পক্ষের ছেলেটা সজাগ পাহারায় থাকে এবং সেই জন্যই ইয়াসিনকে ভয় নেই।

অস্বস্তির কাঁটা-জর্জর মন আর একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা পুষে পুষে কিছুদিন কাটল, অবশেষে সেই দুধকন্যার সাহচর্যের আশ্চর্য সুযোগ এল হাতের মুঠোয়।

কি মনে হল, কিরায়া ফেরত জাহেদ ব্যাপারীর বাসার সম্মুখে থামল ইয়াসিন। ঢুকতে ঢুকতে ডাকল, 'ব্যাপারী আচেন নাহি?' কিন্তু উত্তর এল না। তার পরিবর্তে যা কানে এল, শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল ইয়াসিন। কান্নার সুর। পদ্মবতী দুধকন্যা কাঁদছে। আবার বার-কয়েক জোরে জোরে ডাকল। তবু উত্তর নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল বিবিজানের ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে।

যেন তর সইল না। ছিলা-ছোড়া তীরের বেগে বারান্দায় উঠে এল ইয়াসিন। জানালাটা খোলাই ছিল। শিক ধরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে

সম্মুখে এগিয়ে এল বিবিজান। তারপর শাওন বর্ষণের মত কান্না। দুধবতী কন্যার চোখের পানি।

'হইল কী বিবিজান!'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল না। রমণীয় স্বপ্নিল দেহটার ভাঁজে ভাঁজে তরঙ্গ তুলে ফোঁপাল আমিনা বিবি। তারপর কথা ফুটল, 'আমারে লইয়া যাইবার পার নি মিঞা?'

'অ্যাঁ!' অবাক বিস্ময়ে যেন আকাশ থেকে পড়ল ইয়াসিন।

'হ। আমারে মাইরা ফেলাইব। শয়তানের ছাও বুড়াডা আমারে কুইর‍্যা কুইর‍্যা খাইব।'

'মকবুল কহানে?'

'সে শালিখের পুত ভাগচে। পারনি, লইয়া যাইবার পার আমারে? সোয়ামীর কাছ থনে ফুসলাইয়া আনচে আমারে। মাইর-ধর কইয়া বুড়া কুত্তাডা তালা লাগাইয়া কামে গেচে। তোমারে কই কিরায়াদার—লইয়া চল আমারে। মীরপুরে সোয়ামীর ঘরে দিয়া আইস।'

শঙ্খবতী বিবিজান পদ্মডাগর নীল চোখ তুলল। অজস্র শ্রাবণের সঞ্চিত গুমোটের বাঁধ ভেঙেছে। পদ্মচোখের কোল বেয়ে ধারা নেমেছে। শ্রাবণের কানায় কানায় ভরন্ত সোঁতার স্রোত। তাজ্জব তাজ্জব! পারভাঙা ধলেশ্বরী যৌবন আর অপূর্ব নরম নিটোল রমণীয় একখানি মসৃণ মুখ। বেহেস্তের সোন্দর পরীর জাত।

পেশীপুষ্ট রোমশ বুকের অন্তরালে রোমাঞ্চ-কাঁপা শিহরণ বৈশাখী মেঘের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাড়ছে। দ্রুততর হচ্ছে স্পন্দন। কয়েকবার ঢোক গিলল ইয়াসিন। অবাক মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল।

'কী, পারবা না মিঞা?' জানলার গরাদের ওপর রাখা ইয়াসিনের একটা হাত স্পর্শ করল বিবিজান।

কালবৈশাখীর বিদ্যুৎ চমকের মত সমস্ত শিরায় শিরায় মাতাল বহ্নিশিখা দপ দপ ক'রে জ্বলে উঠল। ঝিলমিল ক'রে উঠল স্নায়ুতন্ত্রী।

বিবিজানের নরম ভীরু হাতটা মুঠো ক'রে ধরল ইয়াসিন, বলল, 'পারুম, লইয়া যামু তুমারে।'

সেই রোমাঞ্চিত মুহূর্তে পাগলা কুত্তার মত খা খা ক'রে এগিয়ে এল সদরঘাটের বুড়ো শালিখ জাহেদ ব্যাপারী। গুইসাপের ছাও। বন্য শূওরের মত ঘোতঘোতিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল, 'ইয়াসিন!' নেড়ি কুত্তার চোখের মত কুতকুতে চোখ দু'টো কপালে উঠে গেল জাহেদ আলীর। তারপর একটা মুহূর্তের ব্যবধানে চোখ নামিয়ে বলল, 'তরে না আমি বিশ্বাস করচিলাম সুমুন্দির পুত। তুই আমার বিবিজানের ইজ্জত মারস্।'

'ইজ্জত!' হিংস্র শ্বাপদের মত রুখে দাঁড়াল ইয়াসিন। 'ইজ্জত কিয়ের মিঞা? পরের বিবিরে ফুসলাইয়া লইয়া আইচ জানি না?'

'আইচি, লইয়া আইচি, তর কিরে হারামীর ছাও?'

'খবরদার!' নৃশংস বাঘের থাবা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল ইয়াসিন। ধরলে মুরগীর মত ছিঁড়ে-খুড়ে ফেলত। কিন্তু পারল না। ঠিক সেই সময়টাতেই বন্দিনী বিবিজানের কণ্ঠের কান্না-আকুতি ইয়াসিনকে বাধা দিল, 'তুমি চইল্যা যাও কিরায়াদার। আমার লেইগ্যা অপমান হইবা ক্যান তুমি?' স্পষ্ট একটা আবেগ-কাঁপা কান্নার গমক।

ফিরেই এল ইয়াসিন। আসবার সময় জাহেদ আলীকে বলল, 'বিবিজানের কথায় ছাইড়া দিলাম তরে, নাইলে কইতরের নাহাল ঘেঁটি ছিঁড়া খাইয়া ফেলাইতাম তরে।'

সেই থেকে জাহেদ ব্যাপারীর সঙ্গে আদায় কাঁচকলায়। কিন্তু তাই ব'লে হাল ছাড়ল না ইয়াসিন। পারভাঙ্গা দুরন্ত ধলেশ্বরী যৌবনের স্বপ্নিল আকর্ষণ লাল জলের মোহের মত পেয়ে বসল। সময়-সুযোগ আর সেই সঙ্গে মার্জার-চতুর প্রতীক্ষা। রাত-বিরাত মাংসাশী শ্বাপদের মত আনাচে কানাচে অতন্দ্র টহল। অবশেষে সুযোগ মিলল। পেছনের জানলার ধার ঘেঁষে ঘাপটি মেরে বসে বসে সময় গুনছিল ইয়াসিন। দাওয়ায়

বসে জাহেদ ব্যাপারী হুক্কার ভুরুক্-টানে মশগুল। ঘরে রাত্রির শয্যা রচনা করছিল আমিনা বিবি। মাথাটা তুলে অদ্ভুত একটা চাপা শব্দ করল ইয়াসিন। চমকে উঠল বিবিজান। জানলার কাছে সরে এসে ফিস ফিস ক'রে বলল, 'পলাও কিরায়াদার, ব্যাপারী পুলিস আনচে।'

জানলা পেরিয়ে আমিনার হাতটা চেপে ধরল ইয়াসিন, 'তুমারে লইয়া যামু বিবিজান।'

ধুকপুক পাখির মত হাতটা কাঁপছিল বিবিজানের। একটু হেসে বলল, 'হপন দেখলা নাকি মিঞা? লইবা ক্যামনে? দরজায় পুলিস পাহারাদার।'

হাতটায় মৃদু চাপ দিল ইয়াসিন, বলল, 'তুমি যাইবা না?'

'কহানে?'

'যদি কই আমার লগে, আমার ঘরে।'

আমিনাবিবি নিরুত্তর।

'মনডা উথল-পাথল করে গো বিবিজান। তুমারে বিবি বানাইয়া বাদশা হমু আমি। আমার মনের মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দিচ তুমি। তুমি ছাড়া নিভাইব কেডা?' মুখটা একেবারে জানলার শিকের কাছাকাছি আনল ইয়াসিন।

এবার মুখ তুলল বিবিজান। পদ্মডাগর নীল চোখের কোণে দু' ফোঁটা মুক্তাবিন্দুর দ্যুতি। বলল, 'যামু। আমারে লইয়া যাইও কিরায়াদার। তোমার ঘরের বিবি হমু আমি।' কি ভাবল। মুখের কাছে মুখ এনে বলল, 'এইবার পলাও।' সঙ্গে সঙ্গে সেই নরম মসৃণ হাতটা মোলায়েম ক'রে বুলিয়ে দিল ইয়াসিনের মুখে।

আশ্চর্য একটা নরম স্পর্শ। একটা অদ্ভুত ভীরু রোমাঞ্চ চনমনিয়ে উঠল রক্তের অণুতে অণুতে।

হপ্তা না ঘুরতেই আবার এল ইয়াসিন মিঞা। খাঁচার পাখিসহ ব্যাপারী উধাও। খোঁজখবর হল, কিন্তু কে বলবে সন্ধান? ঢাকা

শহরের কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে, কে জানে? ব্যাপারীখানার কারবার গুঁটিয়ে জাহেদ ব্যাপারা সরে পড়েছে।

আশ্চর্য এক অনুভূতি জ্যোৎস্নার স্পর্শের মত স্নায়ুতে স্নায়ুতে মিলে-মিশে রয়েছে। পদ্মকলি হাতের সেই মসৃণ-নরম স্পর্শশিখা আশ্চর্য রোমাঞ্চ শিহরণ হয়ে ফুটে রয়েছে দেহের অণুতে অণুতে।

ভুল করেছিল ইয়াসিন মিঞা। মুখে রুমাল-গোঁজা যে অচেতন দেহটা নেতিয়ে পড়েছিল মধ্যরাত্রির বুভুক্ষু প্রহরে, সে বিবিজান। পদ্মবিবি। আমিনা। পনের দিনের অতন্দ্র চোখের পলায়ন-প্রবৃত্তি অবশেষে সুযোগ এনে দিয়েছিল। জাহেদ ব্যাপারীর চোখে ধূলা দিয়ে মীরপুরে পালাচ্ছিল আমিনাবিবি।

খোদা-তায়ালার অপার দোয়া। সেই সংজ্ঞাহীন দেহটা কাঁধে নিয়ে ড্যারায় ফিরেছিল ইয়াসিন মিঞা। জ্ঞান ফিরলে মুক্তা ছড়িয়ে হাসল বিবিজান, বলল, 'কা গো মিঞা, বিবিরে পাইয়া দিল খুশ হইচে নি?'

'হ।' আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল ইয়াসিন। 'আসমানের বিজলী নাইম্যা আইচে আমার ঘরে। জীবন ভইরা রোজা-নামাজের দাম পাইলাম, আমার বেগমরে পাইলাম আমি।' আবেগ থরথর হাতে বিবিজানের মাথায় হাত বুলাল ইয়াসিন, বলল, 'আমার ঘরে চান্দের কন্যা, সব আল হইয়া গেছে আমার বিবিজান।'

আমিনা বিবি হাসল। স্ফুরিত অধর দু'টো কেঁপে কেঁপে মণি-মুক্তোর দ্যুতি ছড়াল, বলল, 'ই-কথা মনে থাকব নি মিঞা, না ওই বুড়া কুত্তার নাহাল গাইলাইবা, মাইরধর করবা আমারে?'

'তুমারে?' উঠে এসে খাটিয়ার উপর গায়ে গা লাগিয়ে বসল ইয়াসিন। 'তুমারে আমার বুকের খাঁচার মধ্যে পঙ্খী বানাইয়া রাখুম বিবিজান।'

দু'টো চারটে দিনের ব্যবধানে ড্যারা ছেড়ে উধাও হল পাখি, পক্ষিনী। ইয়াসন নারায়ণগঞ্জে উঠে এল শঙ্খবতী বিবিজানকে নিয়ে। নিশ্চিন্ত আশ্রয়। জাহেদ ব্যাপারীর কুটিল দৃষ্টি এত দূরে পৌছবে না নিশ্চিত।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আর একটি প্রাণীর সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠল আমিনা বিবির দেহে। ইয়াসিনের বংশধর আসছে। আসমানি কন্যার দেহে তারই আভাস। পাপড়ি কমনীয় মুখে মুঠো মুঠো পলাশ রঙের ঔজ্জ্বল্য।

শুধু দেহেই নয়, আশ্চর্য এক পরিবর্তন এল আমিনাবিবির মনে-প্রাণে। একটা বৎসরের সীমিত সময়ে তার দিলের রঙ বদলাল। রাহাজানি, গাঁটকাটার কুপথ থেকে টেনে আনতে চাইল ইয়াসিনকে। বলল, 'ই পাপের কাম ছাইড়্যা দাও। আমারে কও তুমি ই-কাম আর করবা না, গুনাহ করবা না আর। পোলা হইলে তারে কইবা কি?' পদ্মডাগর চোখের কোণে দু'ফোঁটা পানি মুক্তাবিন্দুর ঔজ্জ্বল্যে ঝকমকিয়ে উঠল, বলল, 'কও, আমারে কও তুমি, নাইলে গলায় কলস বাইন্দ্যা ডুইব্যা মরুম গাঙের পানিতে।'

সেই করুণ আকুতিতে দুর্ধর্ষ ইয়াসিন মিঞা ফিরে এসেছিল নোঙরা পথের মায়া কাটিয়ে। কিন্তু তখন কি ছাই জানত ইয়াসিন যে, এই শঙ্খবতী বিবিজানই একদিন তার উজ্জ্বল জীবনযাত্রায় কয়লা-কালো পরিণতি টেনে দেবে। বিশ্বাসের পাদমূলে কুঠার-শক্ত আঘাত করে শ্বেত-শুভ্র আসমানি শঙ্খচিল যাযাবর মেঘের মত উধাও হবে!

কিন্তু তাই ঘটল। প্রেম-ভালবাসার খাঁচায় বন্দিনী সেই আমিনা বিবি একটা বিকেলের অনুপস্থিতির সুযোগে হারিয়ে গেল। শূন্য ঘরে সিঞ্জিনী-নূপুর সেই আশ্চর্য গীতছন্দ কথার কলি আর ফুটবে না। মুক্তার ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে আর হাসবে না পরম রমণীয় একটি নরম-নিটোল পদ্মকলি মুখ।

ছুটে বেরিয়ে এল ইয়াসিন। বাওর-ঘূর্ণি ঝড়ের মত মধ্যরাত্রে ছুটে এল জাহাজ ঘাটে। শীতলক্ষার টলটলে পানির স্বচ্ছতায় প্রেত-দেহের মত জাহাজগুলো নোঙর করা। সাইক্লোনগতি উন্মাদ ইয়াসিন খুঁজল। আতিপাতি। কিন্তু সেই একখণ্ড শ্বেত-শুভ্র হাল্কা মেঘ উড়ে গিয়েছে।

গলার পেশী ফুলিয়ে সমস্ত শক্তি উজাড় করে পরিত্রাহি ডাকল ইয়াসিন, 'বি—বি—জা—ন।' হাজার লক্ষ ডাক শূন্য প্রান্তরে মিলিয়ে গেল। বিবিজান এল না। সেই আতর-গন্ধ সোহাগবিবি ফিরে এল না। সেই সঙ্গে সন্ধান মিলল না তিন বৎসরের মেয়েটার।

কয়েকটা অতন্দ্র দিন রাত্রি খসে খসে গেল উদ্বিগ্নতায়। ঢাকা শহরে আতিপাতি খুঁজল আড়াইশো সাকরেদ। অবশেষে পুরো ন-টা মাস বাদে সন্ধান মিলল সেই বিবিজানের। মুন্সীগঞ্জের মিঞা-চৌধুরীর আব্রু আড়াল অন্দর মহলের নয়া বেগম-বিবি আমিনা খাতুনের। সহস্র শ্বাপদের ভয়ংকর হিংস্রতা রক্তে গুনগুনিয়ে উঠল। তারপর অনেকগুলো অধীর দিনের অবসান ঘটল।

নির্বাক তামসী রাত্রির মধ্য প্রহরে দিল্‌বাগের সেই খুশ্‌বু আঁধার বেগম বিবির শেষ গীতছন্দ কথাকলি চিরকালের মত মিলিয়ে গেল। বেইমান জেনানা আমিনা বিবির পাখি-ধুকপুক জীবন সুতীক্ষ্ণ ছোরার আঘাতে চিরে ফেলল ইয়াসিন মিঞা। তারপর মিঞা-চৌধুরীর বন্দুকের বুলেট বিদ্ধ দক্ষিণ পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাচ্চাটাকে বগলে চেপে নদীর পার, আর সেখান থেকে ছয় দাড়ির ছিপে চড়ে ধলেশ্বরী পেরিয়ে একেবারে সিরাজগঞ্জ।

রাত্রির অতন্দ্র প্রহরগুলো নির্ঘুম চোখের নিষ্পলক পাহারায় ঘষে ঘষে এগিয়ে চলল। নিরঙ্কুশ উপবাস-যন্ত্রণায় অভুক্ত মেয়েটা ছটফট করছে। ভাগ্যের এই পরিণতি। ভিক্ষাসম্বল দু'টো জীবন। না-না, বকসাদা পদ্মকন্যা নয়, শঙ্খচূড়। কালনাগিনী শঙ্খচূড় সেই বেইমান জেনানা বিবিজান।

রক্তের অণুতে অণুতে সূক্ষ্মতম অভীপ্সা ফুলে ফুলে উঠছে আশ্চর্য রোমাঞ্চে। বাখারি জানলা ঘেঁষা একটা সুপুষ্ট আসমানী দেহের ধলেশ্বরী যৌবন স্নায়ুতে স্নায়ুতে কাচি মদের উন্মাদনা ছড়িয়েছে। শুধু আলতাফই উন্মাদ হয়নি, অপেক্ষমানা সেই পণ্যাঙ্গনা তীব্র বিষে জর্জর করেছে ইয়াসিন মিঞাকেও।

বাচ্চাটা কাত্ হয়ে নেতিয়ে পড়েছে অচৈতন্য ঘুমে। দীর্ঘ অধীর প্রতীক্ষার অবসান। ট্যাকে ছ' আনা পয়সার সজাগ অস্তিত্বের উত্তাপ এখনও আগুনের শিখার মত ছোঁক ছোঁক তপ্ত স্পর্শ বুলোচ্ছে।

তামসী রাত্রির শেষযামে আবার শব্দটা উঠল। দ্রুততর হচ্ছে শব্দটা। ক্রাচ্ নির্ভর একটা মুক্তদেহ দুলে দুলে এগুচ্ছে অদ্ভুত উন্মাদনায়। বাখারি জানালা ঘেঁষা পুরুষ্টু ধলেশ্বরী যৌবনের আশ্চর্য স্বপ্নিল সম্ভাবনার আকর্ষণ বৈশাখী মেঘের মত ফুলে ফেঁপে উঠছে। না, শঙ্খবতী নয়, কালনাগিনা শঙ্খচূড়ের জাত। শেষ রাত্রির সীমিত সময়ে এক এক করে জাত-শঙ্খচূড়ের বিষদাঁত তুলবে, ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে আশ্চর্য স্বপ্নিল রমনীয় দেহ। ট্যাকে হাত দিল ইয়াসিন। হ্যাঁ, আর তার জন্যে ছ' আনা পয়সাই যথেষ্ট।

ক-টা পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল ইয়াসিন। রাত্রির শেষ প্রহরে পরিত্রাহি কান্নার গমক আসছে যেন! না, কান্না নয়, ঝড় তুলে এগিয়ে আসছে একটা আর্ত চিৎকার। ক্রাচে ভর করে ছিলাছেঁড়া ধনুকের মত টান টান হয়ে ঘুরে দাঁড়াল ইয়াসিন সহসা। আর সেই মুহূর্তেই পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল একটা দেহ।

দাঁতে দাঁত ঘষে গর্জে উঠল ইয়াসিন। জোর করে ক্রাচটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কত কাল আর আমারে জালাবি শয়তান? চক্ষের পাতা না বুইজা কত কাল পাহারা দিবি আমারে?'

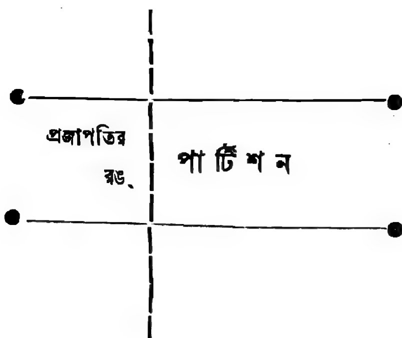
ক্রাচটা আবার বন্দী হ'ল দু'টো কচি নরম বাহুর কঠিন ঘেরাটোপের মধ্যে। পানিসিক্ত একজোড়া ডাগর চোখ তুলল বাচ্চাটা, বলল, 'না বাজান, না। তুমারে যাইবার দিমু না আমি।'

—'দিবি না?' ক্রাচ তুলে সজোরে একটা গুঁতো মারল ইয়াসিন মেয়েটিকে। 'শয়তান! ঘুমের ভান কইরা পাহারা দ্যাস আমারে! যামু আমি, যামু—'

এবার ক্রাচশুদ্ধ ইয়াসিনের কোমর জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। শ্বাপদ এক জোড়া দৃষ্টির সম্মুখে মুখ তুলে তাকাল, বলল, 'না-না-না, কিছুতেই তুমারে

যাইবার দিমু না বাজান, দিমু না।' সঙ্গে সঙ্গে ইয়াসিনের দেহ জড়িয়ে হাউমাউ কেঁদে উঠল সাত বছরের মেয়েটা।

এক হাতে মেয়ের মাথা ছুঁয়ে উর্ধ্বে তাকাল ইয়াসিন, 'আল্লাহ্-তায়ালা, খোদা বন্দেজ! গুনাহ মাপ কর আল্লা। জাত শঙ্খচূড়ের ছোবল থনে বাঁচাইচ আমারে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে শঙ্খচূড় ফণা তুইল্যা গর্জায়, তার থিকা বাঁচাও, বাঁচাও আমারে।'



দুই পাশে দুই পরিবার, মাঝখানে ব্যবধান শুধুমাত্র একটা পার্টিশনের। ইঁট-সিমেন্টের নয়, কাঠের তক্তাফক্তা, প্লাইউড, অ্যাসবেস্টাস শীট অথবা প্লেন করোগেট শীটের হ'লেও কথা ছিল। তাতেও স্বস্তি পাওয়া যেত, নিশ্চিন্ত হওয়ার পথ থাকত। কিন্তু কী ক'রে গৌরী জানবে যে, বাড়িওয়ালা শেষকালে এমন একটা দায়সারা কাজ করে দেবে! দায়সারা বলে দায়সারা! তার চেয়ে বাপু না দিতে, সেও ভাল ছিল। যেমন ছিল থাকত তেমনি। তা নয়, এ যেন লুকোচুরি খেলতে বসে ছেঁড়া কাপড়ের আব্রুর আড়াল। হুবহু কাকের মত চোখ বন্ধ করে জিনিস লুকোনো যেন।

তবু পার্টিশন তো বটেই। আগে এ-টুকুও ছিল না। দুই বাসার এক উঠোন, এক বারান্দা। প্রথম প্রথম মন্দ লাগেনি। মিনতির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল ক-দিনেই। কত কথা, কত গল্প। ওদেরও গৌরীর মত ঝরঝরে সংসার। ছেলেপুলে নেই। শুধু স্বামী আর স্ত্রী, দু'জন। কিন্তু মিনতিকে ভাল লাগলেও ওর স্বামীকে কেন যেন মোটে সহ্য করতে পারে না গৌরী। সেই সূত্রেই কিনা বলা যায় না, হঠাৎ একদিন গৌরীর মনে হল, না, এ-ভাবে সংসার করা চলে না। সব মানুষের সংসারেই গোপনীয় কিছু না কিছু থাকেই। কিন্তু তা রাখবার জো কি আছে নাকি এখানে? হা-উদলা

মাঠঘাট আর এই বাড়ি যেন একই রকমের। সব সময় পায়ে-পায়ে লেগে রয়েছে মিনতি। দিনের মধ্যে অন্তত চব্বিশবার ও আসে। এটা-ওটা দেখে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে। শেষকালে আর সইতে পারল না গৌরী। নির্মলকে সব খুলে বলল। আর তাই নিয়ে হঠাৎ একদিন ভয়ঙ্কর মত আগুন জ্বলল।

রবিবারের অখণ্ড অবসরের সুযোগে বাজারটা সেরে দিয়ে নির্মল গিয়েছিল তার এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে। ফিরল যখন, বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা। ঘরে ঢুকেই দেখতে পেল নির্মল, অবাক কাণ্ড! গোঁজ হয়ে বসে রয়েছে গৌরী। চুলগুলো এলোমেলো, পরনে সেই সকালের শাড়িখানাই রয়েছে। বুঝতে পারল নির্মল, এখনও স্নান হয় নি গৌরীর। এমন থমথমে ভাব দেখে সহসা কথা বলতে সাহস পেল না। কাপড় ছেড়ে লুঙ্গিটা কোমরে আঁটতে আঁটতে এগিয়ে এসে বলল, 'বসে রয়েছ যে?'

,বসে থাকব না তো করব কী?' ঝাঁঝিয়ে উঠল গৌরী।

'স্নান কর নি দেখছি!'

'থাক, স্নান করার দরকার নেই আমার। তুমি খুশিমত স্নান করগে যাও।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নির্মল। সকালে যখন ও বেরোয়, বেশ খুশী খুশীই দেখে গিয়েছে গৌরীকে! কিন্তু হঠাৎ এমন পরিবর্তন! এ যেন শ্রাবণের বৃষ্টি। বলা নেই, কওয়া নেই, ঝুপ-ঝুপ নামলেই হ'ল। অনেক ভেবেও আসল কারণটা আবিষ্কার করতে না পেরে বলল, 'কী হ'ল আবার তোমার শুনি?'

'কী হবার আর বাকী রেখেছ তুমি? ছাই-পাশ মাথা-মুণ্ডু সব, সব হয়েছে আমার।' জোরে কথা ক-টা বলে হাঁপাতে লাগল গৌরী।

ভয়ঙ্কর একটা ঝড়ের সম্ভাবনায় সহসা বোবা হয়ে গেল নির্মল। না হয়েও উপায় নেই। ও জানে, এর ওপর কিছু বলতে যাওয়া মানেই আগুন উস্কে দেওয়া। আর ইচ্ছা ক'রে কে তা চায়! একে তো শুরু হয়েছেই,

তার ওপর আরও যদি উস্কে ওঠে তা হলে দিন দু'য়েক ধরে অন্তত তার জের চলবে। তাতে শুধু শুধু শান্তিই বিঘ্নিত হবে। সে কথা ভেবেই সহসা মুখ খুলতে সাহস পেল না নির্মল।

ভেবেছিল স্নানের জন্য এগোবে, কিন্তু পা বাড়াতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। লুঙ্গির প্রান্ত ধরে ফেলেছে গৌরী। মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল গৌরী, 'কেন, কী করেছিলাম আমি তোমার, শুনি ?'

রীতিমত অবাক কাণ্ড!

কী যে হয়েছে আর কী যে করেছে গৌরী, ভেবে পেল না নির্মল। এইটুকু সময়ের মধ্যে এমন কী ঘটল, যার জন্য এমন ক্ষেপে উঠতে পারল গৌরী! তবে কি ও-বাসার অসিতবাবু···কিন্তু না, তাও বোধ হয় নয়। তবে ? আশমান জমিন ভাবতে লাগল নির্মল। কিন্তু ভেবেও কুল কিনারা পেল না।

গৌরীর অনেক অভিযোগের মধ্যে একটাই সবচেয়ে বড়। আর সে কথাটা প্রায়ই শোনায় গৌরী। নির্মলই নাকি মাটি করে দিয়েছে গৌরীর জীবনটা। কিন্তু আসলে এ অভিযোগ কি কথাটা মিথ্যা। গৌরীর জীবন যদি কেউ মাটি করে থাকে, সে ওরই বাবা। তার জন্য নির্মলকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। নিতান্ত গোবেচারী মানুষ ও। হেরম্যান-হ্যারল্ড কোম্পানির সামান্য বেতনভোগা একজন কেরানী মাত্র। বছর দু'য়েক আগে সব কিছু জেনে-শুনে, চাকরি এবং সংসারের অবস্থা দেখেই গৌরীকে নির্মলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। তখন সস্তা-খরচের একটা মেসে থাকত নির্মল। বিয়ের দিন ঠিক হওয়ার পর বেলেঘাটায় একটা বাসা করল। ছোট বাসা। আর সেখানেই কেটে গেল পৌনে দু' বৎসর।

জীবন মাটি হ'ল কি হয়েছে তার জন্য কোন চিন্তা নেই নির্মলের মনে। সামান্য বেতনের একজন চাকুরের পক্ষে এর চেয়ে ভালভাবে থাকবার স্বপ্ন

বিবিজানের নরম ভীরু হাতটা মুঠো ক'রে ধরল ইয়াসিন, বলল, 'পারুম, লইয়া যামু তুমারে।'

সেই রোমাঞ্চিত মুহূর্তে পাগলা কুত্তার মত খা খা ক'রে এগিয়ে এল সদরঘাটের বুড়ো শালিখ জাহেদ ব্যাপারী। গুইসাপের ছাও। বন্য শূওরের মত ঘোতঘোতিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল, 'ইয়াসিন!' নেড়ি কুত্তার চোখের মত কুতকুতে চোখ দু'টো কপালে উঠে গেল জাহেদ আলীর। তারপর একটা মুহূর্তের ব্যবধানে চোখ নামিয়ে বলল, 'তরে না আমি বিশ্বাস করচিলাম সুমুন্দির পুত। তুই আমার বিবিজানের ইজ্জত মারস্।'

'ইজ্জত!' হিংস্র শ্বাপদের মত রুখে দাঁড়াল ইয়াসিন। 'ইজ্জত কিয়ের মিঞা? পরের বিবিরে ফুসলাইয়া লইয়া আইচ জানি না?'

'আইচি, লইয়া আইচি, তর কিরে হারামীর ছাও?'

'খবরদার!' নৃশংস বাঘের থাবা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল ইয়াসিন। ধরলে মুরগীর মত ছিঁড়ে-খুড়ে ফেলত। কিন্তু পারল না। ঠিক সেই সময়টাতেই বন্দিনী বিবিজানের কণ্ঠের কান্না-আকুতি ইয়াসিনকে বাধা দিল, 'তুমি চইল্যা যাও কিরায়াদার। আমার লেইগ্যা অপমান হইবা ক্যান তুমি?' স্পষ্ট একটা আবেগ-কাঁপা কান্নার গমক।

ফিরেই এল ইয়াসিন। আসবার সময় জাহেদ আলীকে বলল, 'বিবিজানের কথায় ছাইড়া দিলাম তরে, নাইলে কইতরের নাহাল ঘেঁটি ছিঁড়া খাইয়া ফেলাইতাম তরে।'

সেই থেকে জাহেদ ব্যাপারীর সঙ্গে আদায় কাঁচকলায়। কিন্তু তাই ব'লে হাল ছাড়ল না ইয়াসিন। পারভাঙ্গা দুরন্ত ধলেশ্বরী যৌবনের স্বপ্নিল আকর্ষণ লাল জলের মোহের মত পেয়ে বসল। সময়-সুযোগ আর সেই সঙ্গে মার্জার-চতুর প্রতীক্ষা। রাত-বিরাত মাংসাশী শ্বাপদের মত আনাচে কানাচে অতন্দ্র টহল। অবশেষে সুযোগ মিলল। পেছনের জানলার ধার ঘেঁষে ঘাপটি মেরে বসে বসে সময় গুনছিল ইয়াসিন। দাওয়ায়

বসে জাহেদ ব্যাপারী হুক্কার ভুরুক্-টানে মশগুল। ঘরে রাত্রির শয্যা রচনা করছিল আমিনা বিবি। মাথাটা তুলে অদ্ভুত একটা চাপা শব্দ করল ইয়াসিন। চমকে উঠল বিবিজান। জানলার কাছে সরে এসে ফিস ফিস ক'রে বলল, 'পলাও কিরায়াদার, ব্যাপারী পুলিস আনচে।'

জানলা পেরিয়ে আমিনার হাতটা চেপে ধরল ইয়াসিন, 'তুমারে লইয়া যামু বিবিজান।'

ধুকপুক পাখির মত হাতটা কাঁপছিল বিবিজানের। একটু হেসে বলল, 'হপন দেখলা নাকি মিঞা? লইবা ক্যামনে? দরজায় পুলিস পাহারাদার।'

হাতটায় মৃদু চাপ দিল ইয়াসিন, বলল, 'তুমি যাইবা না?'

'কহানে?'

'যদি কই আমার লগে, আমার ঘরে।'

আমিনাবিবি নিরুত্তর।

'মনডা উথল-পাথল করে গো বিবিজান। তুমারে বিবি বানাইয়া বাদশা হমু আমি। আমার মনের মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দিচ তুমি। তুমি ছাড়া নিভাইব কেডা?' মুখটা একেবারে জানলার শিকের কাছাকাছি আনল ইয়াসিন।

এবার মুখ তুলল বিবিজান। পদ্মডাগর নীল চোখের কোণে দু' ফোঁটা মুক্তাবিন্দুর দ্যুতি। বলল, 'যামু। আমারে লইয়া যাইও কিরায়াদার। তোমার ঘরের বিবি হমু আমি।' কি ভাবল। মুখের কাছে মুখ এনে বলল, 'এইবার পলাও।' সঙ্গে সঙ্গে সেই নরম মসৃণ হাতটা মোলায়েম ক'রে বুলিয়ে দিল ইয়াসিনের মুখে।

আশ্চর্য একটা নরম স্পর্শ। একটা অদ্ভুত ভীরু রোমাঞ্চ চনমনিয়ে উঠল রক্তের অণুতে অণুতে।

হপ্তা না ঘুরতেই আবার এল ইয়াসিন মিঞা। খাঁচার পাখিসহ ব্যাপারী উধাও। খোঁজখবর হল, কিন্তু কে বলবে সন্ধান? ঢাকা

শহরের কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে, কে জানে? ব্যাপারীখানার কারবার গুঁটিয়ে জাহেদ ব্যাপারা সরে পড়েছে।

আশ্চর্য এক অনুভূতি জ্যোৎস্নার স্পর্শের মত স্নায়ুতে স্নায়ুতে মিলে-মিশে রয়েছে। পদ্মকলি হাতের সেই মসৃণ-নরম স্পর্শশিখা আশ্চর্য রোমাঞ্চ শিহরণ হয়ে ফুটে রয়েছে দেহের অণুতে অণুতে।

ভুল করেছিল ইয়াসিন মিঞা। মুখে রুমাল-গোঁজা যে অচেতন দেহটা নেতিয়ে পড়েছিল মধ্যরাত্রির বুভুক্ষু প্রহরে, সে বিবিজান। পদ্মবিবি। আমিনা। পনের দিনের অতন্দ্র চোখের পলায়ন-প্রবৃত্তি অবশেষে সুযোগ এনে দিয়েছিল। জাহেদ ব্যাপারীর চোখে ধূলা দিয়ে মীরপুরে পালাচ্ছিল আমিনাবিবি।

খোদা-তায়ালার অপার দোয়া। সেই সংজ্ঞাহীন দেহটা কাঁধে নিয়ে ড্যারায় ফিরেছিল ইয়াসিন মিঞা। জ্ঞান ফিরলে মুক্তা ছড়িয়ে হাসল বিবিজান, বলল, 'কা গো মিঞা, বিবিরে পাইয়া দিল খুশ হইচে নি?'

'হ।' আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল ইয়াসিন। 'আসমানের বিজলী নাইম্যা আইচে আমার ঘরে। জীবন ভইরা রোজা-নামাজের দাম পাইলাম, আমার বেগমরে পাইলাম আমি।' আবেগ থরথর হাতে বিবিজানের মাথায় হাত বুলাল ইয়াসিন, বলল, 'আমার ঘরে চান্দের কন্যা, সব আলা হইয়া গেছে আমার বিবিজান।'

আমিনা বিবি হাসল। স্ফুরিত অধর দু'টো কেঁপে কেঁপে মণি-মুক্তোর দ্যুতি ছড়াল, বলল, 'ই-কথা মনে থাকব নি মিঞা, না ওই বুড়া কুত্তার নাহাল গাইলাইবা, মাইরধর করবা আমারে?'

'তুমারে?' উঠে এসে খাটিয়ার উপর গায়ে গা লাগিয়ে বসল ইয়াসিন। 'তুমারে আমার বুকের খাঁচার মধ্যে পক্ষী বানাইয়া রাখুম বিবিজান।'

দু'টো চারটে দিনের ব্যবধানে ড্যারা ছেড়ে উধাও হল পাখি, পক্ষিনী। ইয়াসিন নারায়ণগঞ্জে উঠে এল শঙ্খবতী বিবিজানকে নিয়ে। নিশ্চিন্ত আশ্রয়। জাহেদ ব্যাপারীর কুটিল দৃষ্টি এত দূরে পৌছবে না নিশ্চিত।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আর একটি প্রাণীর সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠল আমিনা বিবির দেহে। ইয়াসিনের বংশধর আসছে। আসমানি কন্যার দেহে তারই আভাস। পাপড়ি কমনীয় মুখে মুঠো মুঠো পলাশ রঙের ঔজ্জ্বল্য।

শুধু দেহেই নয়, আশ্চর্য এক পরিবর্তন এল আমিনাবিবির মনে-প্রাণে। একটা বৎসরের সীমিত সময়ে তার দিলের রঙ বদলাল। রাহাজানি, গাঁটকাটার কুপথ থেকে টেনে আনতে চাইল ইয়াসিনকে। বলল, 'ই পাপের কাম ছাইড়্যা দাও। আমারে কও তুমি ই-কাম আর করবা না, গুনাহ করবা না আর। পোলা হইলে তারে কইবা কি?' পদ্মডাগর চোখের কোণে দু'ফোঁটা পানি মুক্তাবিন্দুর ঔজ্জ্বল্যে ঝকমকিয়ে উঠল, বলল, 'কও, আমারে কও তুমি, নাইলে গলায় কলস বাইন্দ্যা ডুইব্যা মরুম গাঙের পানিতে।'

সেই করুণ আকুতিতে দুর্ধর্ষ ইয়াসিন মিঞা ফিরে এসেছিল নোঙরা পথের মায়া কাটিয়ে। কিন্তু তখন কি ছাই জানত ইয়াসিন যে, এই শঙ্খবতী বিবিজানই একদিন তার উজ্জ্বল জীবনযাত্রায় কয়লা-কালো পরিণতি টেনে দেবে। বিশ্বাসের পাদমূলে কুঠার-শক্ত আঘাত করে শ্বেত-শুভ্র আসমানি শঙ্খচিল যাযাবর মেঘের মত উধাও হবে!

কিন্তু তাই ঘটল। প্রেম-ভালবাসার খাঁচায় বন্দিনী সেই আমিনা বিবি একটা বিকেলের অনুপস্থিতির সুযোগে হারিয়ে গেল। শূন্য ঘরে সিঞ্জিনী-নূপুর সেই আশ্চর্য গীতছন্দ কথার কলি আর ফুটবে না। মুক্তার ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে আর হাসবে না পরম রমণীয় একটি নরম-নিটোল পদ্মকলি মুখ।

ছুটে বেরিয়ে এল ইয়াসিন। বাওর-ঘূর্ণি ঝড়ের মত মধ্যরাত্রে ছুটে এল জাহাজ ঘাটে। শীতলক্ষার টলটলে পানির স্বচ্ছতায় প্রেত-দেহের মত জাহাজগুলো নোঙর করা। সাইক্লোনগতি উন্মাদ ইয়াসিন খুঁজল। আতিপাতি। কিন্তু সেই একখণ্ড শ্বেত-শুভ্র হাল্কা মেঘ উড়ে গিয়েছে।

গলার পেশী ফুলিয়ে সমস্ত শক্তি উজাড় করে পরিত্রাহি ডাকল ইয়াসিন, 'বি—বি—জা—ন।' হাজার লক্ষ ডাক শূন্য প্রান্তরে মিলিয়ে গেল। বিবিজান এল না। সেই আতর-গন্ধ সোহাগবিবি ফিরে এল না। সেই সঙ্গে সন্ধান মিলল না তিন বৎসরের মেয়েটার।

কয়েকটা অতন্দ্র দিন রাত্রি খসে খসে গেল উদ্বিগ্নতায়। ঢাকা শহরে আতিপাতি খুঁজল আড়াইশো সাকরেদ। অবশেষে পুরো ন-টা মাস বাদে সন্ধান মিলল সেই বিবিজানের। মুন্সীগঞ্জের মিঞা-চৌধুরীর আব্রু আড়াল অন্দর মহলের নয়া বেগম-বিবি আমিনা খাতুনের। সহস্র শ্বাপদের ভয়ংকর হিংস্রতা রক্তে গুনগুনিয়ে উঠল। তারপর অনেকগুলো অধীর দিনের অবসান ঘটল।

নির্বাক তামসী রাত্রির মধ্য প্রহরে দিল্‌বাগের সেই খুশ্‌বু আঁধার বেগম বিবির শেষ গীতছন্দ কথাকলি চিরকালের মত মিলিয়ে গেল। বেইমান জেনানা আমিনা বিবির পাখি-ধুকপুক জীবন সুতীক্ষ্ণ ছোরার আঘাতে চিরে ফেলল ইয়াসিন মিঞা। তারপর মিঞা-চৌধুরীর বন্দুকের বুলেট বিদ্ধ দক্ষিণ পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাচ্চাটাকে বগলে চেপে নদীর পার, আর সেখান থেকে ছয় দাড়ির ছিপে চড়ে ধলেশ্বরী পেরিয়ে একেবারে সিরাজগঞ্জ।

রাত্রির অতন্দ্র প্রহরগুলো নির্ঘুম চোখের নিষ্পলক পাহারায় ঘষে ঘষে এগিয়ে চলল। নিরঙ্কুশ উপবাস-যন্ত্রণায় অভুক্ত মেয়েটা ছটফট করছে। ভাগ্যের এই পরিণতি। ভিক্ষাসম্বল দু'টো জীবন। না-না, বকসাদা পদ্মকন্যা নয়, শঙ্খচূড়। কালনাগিনী শঙ্খচূড় সেই বেইমান জেনানা বিবিজান।

রক্তের অণুতে অণুতে সূক্ষ্মতম অভীপ্সা ফুলে ফুলে উঠছে আশ্চর্য রোমাঞ্চে। বাখারি জানলা ঘেঁষা একটা সুপুষ্ট আসমানী দেহের ধলেশ্বরী যৌবন স্নায়ুতে স্নায়ুতে কাচি মদের উন্মাদনা ছড়িয়েছে। শুধু আলতাকই উন্মাদ হয়নি, অপেক্ষমানা সেই পণ্যাঙ্গনা তীব্র বিষে জর্জর করেছে ইয়াসিন মিঞাকেও।

বাচ্চাটা কাত্‌ হয়ে নেতিয়ে পড়েছে অচৈতন্য ঘুমে। দীর্ঘ অধীর প্রতীক্ষার অবসান। ট্যাকে ছ' আনা পয়সার সজাগ অস্তিত্বের উত্তাপ এখনও আগুনের শিখার মত ছোঁক ছোঁক তপ্ত স্পর্শ বুলোচ্ছে।

তামসী রাত্রির শেষযামে আবার শব্দটা উঠল। দ্রুততর হচ্ছে শব্দটা। ক্রাচ্‌ নির্ভর একটা মুক্তদেহ দুলে দুলে এগুচ্ছে অদ্ভুত উন্মাদনায়। বাখারি জানালা ঘেঁষা পুরুষ্টু ধনেশ্বরী যৌবনের আশ্চর্য স্বপ্নিল সম্ভাবনার আকর্ষণ বৈশাখী মেঘের মত ফুলে ফেঁপে উঠছে। না, শঙ্খবতী নয়, কালনাগিনী শঙ্খচূড়ের জাত। শেষ রাত্রির সীমিত সময়ে এক এক করে জাত-শঙ্খচূড়ের বিষদাঁত তুলবে, ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে আশ্চর্য স্বপ্নিল রমনীয় দেহ। ট্যাকে হাত দিল ইয়াসিন। হ্যাঁ, আর তার জন্যে ছ' আনা পয়সাই যথেষ্ট।

ক-টা পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল ইয়াসিন। রাত্রির শেষ প্রহরে পরিত্রাহি কান্নার গমক আসছে যেন! না, কান্না নয়, ঝড় তুলে এগিয়ে আসছে একটা আর্ত চিৎকার। ক্রাচে ভর করে ছিলাছেঁড়া ধনুকের মত টান টান হয়ে ঘুরে দাঁড়াল ইয়াসিন সহসা। আর সেই মুহূর্তেই পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল একটা দেহ।

দাঁতে দাঁত ঘষে গর্জে উঠল ইয়াসিন। জোর করে ক্রাচটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কত কাল আর আমারে জ্বালাবি শয়তান? চক্ষের পাতা না বুইজা কত কাল পাহারা দিবি আমারে?'

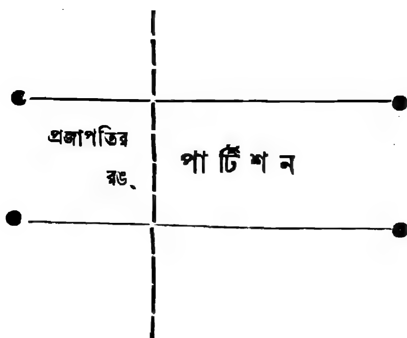
ক্রাচটা আবার বন্দী হ'ল দু'টো কচি নরম বাহুর কঠিন ঘেরাটোপের মধ্যে। পানিসিক্ত একজোড়া ডাগর চোখ তুলল বাচ্চাটা, বলল, 'না বাজান, না। তুমারে যাইবার দিমু না আমি।'

—'দিবি না?' ক্রাচ তুলে সজোরে একটা গুঁতো মারল ইয়াসিন মেয়েটিকে। 'শয়তান! ঘুমের ভান কইরা পাহারা দ্যাস আমারে! যামু আমি, যামু—'

এবার ক্রাচশুদ্ধ ইয়াসিনের কোমর জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। শ্বাপদ এক জোড়া দৃষ্টির সম্মুখে মুখ তুলে তাকাল, বলল, 'না-না-না, কিছুতেই তুমারে

যাইবার দিমু না বাজান, দিমু না।' সঙ্গে সঙ্গে ইয়াসিনের দেহ জড়িয়ে হাউমাউ কেঁদে উঠল সাত বছরের মেয়েটা।

এক হাতে মেয়ের মাথা ছুঁয়ে ঊর্ধে তাকাল ইয়াসিন, 'আল্লাহ্-তায়ালা, খোদা বন্দেজ! গুনাহ মাপ কর আল্লা। জাত শঙ্খচূড়ের ছোবল থনে বাঁচাইচ আমারে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে শঙ্খচূড় ফণা তুইল্যা গর্জায়, তার থিকা বাঁচাও, বাঁচাও আমারে।'



দুই পাশে দুই পরিবার, মাঝখানে ব্যবধান শুধুমাত্র একটা পার্টিশনের। ইঁট-সিমেণ্টের নয়, কাঠের তক্তাফক্তা, প্লাইউড, অ্যাসবেস্টাস শীট অথবা প্লেন করোগেট শীটের হ'লেও কথা ছিল। তাতেও স্বস্তি পাওয়া যেত, নিশ্চিন্ত হওয়ার পথ থাকত। কিন্তু কী ক'রে গৌরী জানবে যে, বাড়িওয়ালা শেষকালে এমন একটা দায়সারা কাজ করে দেবে! দায়সারা বলে দায়সারা! তার চেয়ে বাপু না দিতে, সেও ভাল ছিল। যেমন ছিল থাকত তেমনি। তা নয়, এ যেন লুকোচুরি খেলতে বসে ছেঁড়া কাপড়ের আব্রুর আড়াল। হুবহু কাকের মত চোখ বন্ধ করে জিনিস লুকোনো যেন।

তবু পার্টিশন তো বটেই। আগে এ-টুকুও ছিল না। দুই বাসার এক উঠোন, এক বারান্দা। প্রথম প্রথম মন্দ লাগেনি। মিনতির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল ক-দিনেই। কত কথা, কত গল্প। ওদেরও গৌরীর মত ঝরঝরে সংসার। ছেলেপুলে নেই। শুধু স্বামী আর স্ত্রী, দু'জন। কিন্তু মিনতিকে ভাল লাগলেও ওর স্বামীকে কেন যেন মোটে সহ্য করতে পারে না গৌরী। সেই সূত্রেই কিনা বলা যায় না, হঠাৎ একদিন গৌরীর মনে হল, না, এ-ভাবে সংসার করা চলে না। সব মানুষের সংসারেই গোপনীয় কিছু না কিছু থাকেই। কিন্তু তা রাখবার জো কি আছে নাকি এখানে? হা-উদলা

মাঠঘাট আর এই বাড়ি যেন একই রকমের। সব সময় পায়ে-পায়ে লেগে রয়েছে মিনতি। দিনের মধ্যে অন্তত চব্বিশবার ও আসে। এটা-ওটা দেখে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে। শেষকালে আর সইতে পারল না গৌরী। নির্মলকে সব খুলে বলল। আর তাই নিয়ে হঠাৎ একদিন ভয়ঙ্কর মত আগুন জ্বলল।

রবিবারের অখণ্ড অবসরের সুযোগে বাজারটা সেরে দিয়ে নির্মল গিয়েছিল তার এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে। ফিরল যখন, বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা। ঘরে ঢুকেই দেখতে পেল নির্মল, অবাক কাণ্ড! গোঁজ হয়ে বসে রয়েছে গৌরী। চুলগুলো এলোমেলো, পরনে সেই সকালের শাড়িখানাই রয়েছে। বুঝতে পারল নির্মল, এখনও স্নান হয় নি গৌরীর। এমন থমথমে ভাব দেখে সহসা কথা বলতে সাহস পেল না। কাপড় ছেড়ে লুঙ্গিটা কোমরে আঁটতে আঁটতে এগিয়ে এসে বলল, 'বসে রয়েছ যে ?'

,বসে থাকব না তো করব কী ?' ঝাঁঝিয়ে উঠল গৌরী।

'স্নান কর নি দেখছি !'

'থাক, স্নান করার দরকার নেই আমার। তুমি খুশিমত স্নান করগে যাও।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নির্মল। সকালে যখন ও বেরোয়, বেশ খুশী খুশীই দেখে গিয়েছে গৌরীকে। কিন্তু হঠাৎ এমন পরিবর্তন ! এ যেন শ্রাবণের বৃষ্টি। বলা নেই, কওয়া নেই, ঝুপ-ঝুপ নামলেই হ'ল। অনেক ভেবেও আসল কারণটা আবিষ্কার করতে না পেরে বলল, 'কী হ'ল আবার তোমার শুনি ?'

'কী হবার আর বাকী রেখেছ তুমি ? ছাই-পাশ মাথা-মুণ্ডু সব, সব হয়েছে আমার।' জোরে কথা ক-টা বলে হাঁপাতে লাগল গৌরী।

ভয়ঙ্কর একটা ঝড়ের সম্ভাবনায় সহসা বোবা হয়ে গেল নির্মল। না হয়েও উপায় নেই। ও জানে, এর ওপর কিছু বলতে যাওয়া মানেই আগুন উস্কে দেওয়া। আর ইচ্ছা ক'রে কে তা চায় ! একে তো শুরু হয়েছেই,

তার ওপর আরও যদি উস্কে ওঠে তা হলে দিন দু'য়েক ধরে অন্তত তার জের চলবে। তাতে শুধু শুধু শান্তিই বিঘ্নিত হবে। সে কথা ভেবেই সহসা মুখ খুলতে সাহস পেল না নির্মল।

ভেবেছিল স্নানের জন্য এগোবে, কিন্তু পা বাড়াতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। লুঙ্গির প্রান্ত ধরে ফেলেছে গৌরী। মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল গৌরী, 'কেন, কী করেছিলাম আমি তোমার, শুনি ?'

রীতিমত অবাক কাণ্ড!

কী যে হয়েছে আর কী যে করেছে গৌরী, ভেবে পেল না নির্মল। এইটুকু সময়ের মধ্যে এমন কী ঘটল, যার জন্য এমন ক্ষেপে উঠতে পারল গৌরী! তবে কি ও-বাসার অসিতবাবু···কিন্তু না, তাও বোধ হয় নয়। তবে ? আশমান জমিন ভাবতে লাগল নির্মল। কিন্তু ভেবেও কুল কিনারা পেল না।

গৌরীর অনেক অভিযোগের মধ্যে একটাই সবচেয়ে বড়। আর সে কথাটা প্রায়ই শোনায় গৌরী। নির্মলই নাকি মাটি করে দিয়েছে গৌরীর জীবনটা। কিন্তু আসলে এ অভিযোগ কি কথাটা মিথ্যা। গৌরীর জীবন যদি কেউ মাটি করে থাকে, সে ওরই বাবা। তার জন্য নির্মলকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। নিতান্ত গোবেচারী মানুষ ও। হেরম্যান-হ্যারল্ড কোম্পানির সামান্য বেতনভোগা একজন কেরানী মাত্র। বছর দু'য়েক আগে সব কিছু জেনে-শুনে, চাকরি এবং সংসারের অবস্থা দেখেই গৌরীকে নির্মলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। তখন সস্তা-খরচের একটা মেসে থাকত নির্মল। বিয়ের দিন ঠিক হওয়ার পর বেলেঘাটায় একটা বাসা করল। ছোট বাসা। আর সেখানেই কেটে গেল পৌনে দু' বৎসর।

জীবন মাটি হ'ল কি হয়েছে তার জন্য কোন চিন্তা নেই নির্মলের মনে। সামান্য বেতনের একজন চাকুরের পক্ষে এর চেয়ে ভালভাবে থাকবার স্বপ্ন

দেখা মানেই আকাশ-কুসুম চিন্তা করা। একটু ভাল খাওয়া পরা বা ভাল থাকতে গেলে যে টাকার প্রয়োজন, তিন মাস রক্তজল করা কি গলায় রক্ত-ওঠা পরিশ্রম করেও সে-টাকা রোজগার করতে পারে না। সুতরাং নির্বিবাদে অভিযোগ মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করেছে।

স্বপ্ন একদিন ও নিজেও দেখত। দেখত প্রথম জীবনে। তারপর কর্মক্ষেত্রে যখন ঢুকল, ঢুকতে বাধ্য হল, দেখল, স্বপ্ন স্বপ্নই আর বাস্তব অনেক কঠিন। ক-বছর আগেও মা বেঁচে ছিলেন। বিধবা মানুষ তাঁর আলাদা ব্যবস্থা। বাবা বেঁচে থাকতে সুখ তো আর কম করেন নি। ছেলের হাতে পড়ে বস্তিতে দিন কাটাতে হচ্ছিল। তবুও চেষ্টা কম করে নি নির্মল। কিন্তু অত চেষ্টাতেও সুখ এল না। স্বস্তিও নয়। ভুগে ভুগিয়ে মা স্বর্গে গেলেন। বস্তি ছেড়ে নির্মল উঠল গিয়ে সস্তা-খরচের একটা মেসে। সেখানেই কাটল কয়েক বৎসর। মাঝে মাঝে মন কেমন করত। ও ভেবেছিল, মাইনে কিছু বেড়েছে যখন, বিয়ে করে বউ নিয়ে একটা সংসার চালাতে খুব কষ্ট হবে না ওর পক্ষে। সম্বন্ধ দু-একটা এদিক ওদিক থেকে এল। মেয়েও দেখা হল কয়েকটি কিন্তু সব জায়গায় ওই এক কথা। বিয়ে সেরে মেয়ে তুলে দেওয়া পর্যন্তই। তার ওপর আর এগোয় না কেউ। যাঁরা এগোন, তাঁদের মেয়ে আবার পছন্দ হয় না। অথচ শ' তিন-চার টাকা নির্মল আশা করে বসে আছে। পণ বললেও বলা যায় বটে কিন্তু নির্মলের দাবির উদ্দেশ্য অন্য। বিয়ের পর দু' চারজন বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ান দরকার। তারপর নতুন সংসারের কত ঝক্কি। সে সব যে ও করবে, সে-সামর্থ্যটুকু নেই বলেই এ-আশা। খরচও কি কম? নতুন বউ মেঝেতে শোয়াবে কেমন করে? অন্তত একখানা ডবল-বেড তক্তপোশ চাই। বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তো আর বউকে বুঝতে দেওয়া যায় না যে, নিতান্তই দরিদ্র ও, গরিব।

কথায় বলে বিয়ে মানে লক্ষ কথা। আর সেই লক্ষ কথার পরই বুঝি সম্বন্ধটা ঠিকঠাক হয়ে গেল। পাকাপাকি হ'য়ে দিন স্থির হয়েও গেল। শ' তিন-চার না হলেও, পণ বাবদ দু'শ টাকা দিতে রাজি হ'লেন মেয়ের বাবা। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যুক্তি করে, হিসাব করে বেলেঘাটায় আধা-বস্তি

ধরনের এলাকায় একটা বাসা ভাড়া করল ও। তা ছাড়া উপায়ই বা কী? এমন কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই যে বিয়ের পর দিন-কয়েক সস্ত্রীক সেখানে থাকতে পারে।

বেলেঘাটার সেই বাসাতেই পৌনে দু'বছর কাটল। প্রথম-প্রথম কোনো অসুবিধা মনে হয় নি। দু'টি মনের অনেক কল্পনা অনেক স্বপ্ন বাস্তবের মিলন-গ্রন্থিতে বাঁধা পড়েছে। সেই সকল স্বপ্নের রঙে রসে ওরা সদ্যোবিবাহিত স্বামী-স্ত্রী আবেগে উৎফুল্ল হয়েছে। ফুল ফোটার পরিণতি দেখেছে ওরা, আর পরস্পরের উষ্ণ-সান্নিধ্যের উত্তাপে ভীরু পাখির মতো থরথর কেঁপে কেটে গেছে অনেক রাত্রির নির্ঘুম প্রহর।

সে-সময় মনেই হয় নি জীবনের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা শিকারী বাঘের মতো ওদের সামনে ওৎ পেতে বসে রয়েছে। সংসারে স্বল্পআয়ী মানুষের বেঁচে থাকা মানেই অগ্নিকুণ্ডের আবর্তে দিনে দিনে নিঃশেষে পুড়ে যাওয়া। আর তাই শুরু হল বিয়ের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতে। পঁচাত্তর টাকা বেতনের মধ্যে পঁয়ত্রিশ টাকা বাসা ভাড়া। রোজ অফিসে যাতায়াতের খরচ, সংসারের বিপুল দাবির কিছু অন্তত মেটাতে মেটাতেই সব শেষ। দিন কুড়ি অতি কষ্টে কাটে তারপর সেই হাত পাতা, সেই ধার আর বন্ধুদের অযাচিত উপদেশ।

প্রথম প্রথম এক আধটু অভিমানের রঙ, মোলায়েম কণ্ঠস্বরে হাসি হাসি অভিযোগের স্পর্শ মিশিয়ে দু'একটা কথা। এ-টা এনো, ও-টা চাই থেকে এ-টা নেই, সে-টা নেই। নেই নেই সেই অভাবের ফিরিস্তি দিন দিন বেড়েই চলল। সেই সঙ্গে অভিমানের সেই রক্ত-গোলাপ ভাবটা দিনে দিনে গৌরীর মুখ থেকে মুছে গিয়ে সেখানে প্রকট হতে লাগল ক্রোধের থমথমে কালো মেঘ।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অভিমান অভিমান, রাগ-বিরাগের রৌদ্র-ছায়াই যদি না থাকল, তবে এই একঘেয়ে চাকা-ঢিলা গরুর গাড়ির মতো জীবনে বৈচিত্র্যের রঙ কোথায়? সেই কথা ভেবেই প্রথম দিকে স্বস্তি পেয়েছিল নির্মল মনে মনে, কিন্তু পরে বুঝতে পারল, ওর মতো লোকের জীবনে সামান্য

একটু আশা-অভিলাষও যেন অভিশাপ। গুরুতর অপরাধ। সে-কথা চিন্তা করা। নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানেই জীবনের জন্যে কঠিন সংগ্রাম। সংগ্রাম দারিদ্র্যের সঙ্গে। অভাবের এই নিবিড় কালো নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের অন্ধকারের মধ্যে এক বিন্দু সুখ-স্বপ্নের আলোকণার জন্য অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করা। দিনান্ত প্রাণপাত পরিশ্রমের মূল্যেও তাই নির্মল আজ গৌরীর জীবন মাটি ক'রে দেওয়ার অপরাধে অপরাধী।

বেলেঘাটার আধা-বস্তি ধরনের সেই পাড়ায় বিবাহিত জীবনের একটা বৎসর ঘুরতে না-ঘুরতেই কঠিন বাস্তবের তিক্ততায় দিনগুলো বিবিয়ে উঠল। এক দিন মরিয়া হয়েই উঠল গৌরী। কেঁদে কেটে, না-খেয়ে না-দেয়ে কী অনাসৃষ্টিই না হল। কত টানাটানি, সাধাসাধি। কিন্তু গৌরীর রাগ আর পড়ে না কিছুতেই। যত বেশি ভোলাবার চেষ্টায় চেষ্টিত হল নির্মল, তত বাড়ল ফোঁপানো কান্নার গমক। দুর্বিনীত গৌরী শেষকালে কেঁদে ফেলল, 'কী করেছিলাম আমি তোমার যে, দিনরাত এই নেই-নেই অভাবের মধ্যে এমন ক'রে পিষে মারছ আমাকে, আটকে রেখেছে গোয়ালের মধ্যে? সাধ-আহ্লাদ বলেও কি কিছু থাকতে নেই আমার?'

জীবন-সংগ্রামে কঠিন বাস্তবের যে সাগর-পরিমাণ ব্যর্থতা, সামান্য মোলায়েম হাসির চেষ্টায় কি আর তা ঢাকা যায়? যায় না। তবু চেষ্টা করল নির্মল, বলল, 'দাঁড়াও, নতুন একটা বাসা খুঁজছি। একবার উঠে যেতে পারলে আর···'

'থাক', প্রায় ফুঁসে উঠল গৌরী, 'ছ' মাস ধরেই ওই এক কথা শুনছি। ও আর হবে না, হবে না। এখানেই পচে গলে মরতে হবে আমাকে জানি।'

'না —না, তুমি দেখোই। মাসটা পেরুলেই একটা ব্যবস্থা করব।'

'কী করবে শুনি, হাতি?' নুন আনতে তো তেল ফুরোয়, তা বাসা ধুয়ে কি জল খাব নাকি? যদি কাচ্চাবাচ্চা থাকত তো···'

সঙ্গে সঙ্গেই হেসে ফেলল নির্মল, বলল, 'তবে কি সে রকম কিছু···' অদ্ভুত দৃষ্টি তুলে গৌরীর দিকে তাকাল।

গৌরার মুখের থমথমে অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ যেন আলোর ছটা ঝিল-মিলিয়ে উঠল। হয়তো খানিকটা পলাশ-রঙ্ ঔজ্জ্বল্য ঠোঁটে গালে চমকাল্। 'ইঃ নিজে শোবার ঠাঁই নেই, আবার...'লজ্জা-নরম দৃষ্টি ছড়িয়ে বলল গৌরী !

বেলেঘাটার এই পরিবেশ, এ তো জীবন নয়, যেন মৃত্যুমুখী কতগুলো মানুষের বেঁচে থাকবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় কোনো রকমে দিন কাটানো। চারদিকে শুধু এ-রই ভিড়। আর সেই মৃত্যুযাত্রী দলের মিছিলের মধ্যে আশৈশব কল্পনার এমন নিষ্ঠুর পরিণাম দেখে, থেকে থেকে শিউরে ওঠে গৌরী। ক'দিনই বা বিয়ে হয়েছে ওর, কিন্তু এই ক'দিনেই আঠারো বৎসরের যত্ন-পোষা কল্পনা এমন ক'রে ভেঙে তচনচ হতে পারে, ও কি জানত সে-কথা ! সামান্য বেতনের ব্রাঞ্চ পোস্ট-মাস্টারের ঘরের চতুর্থ কন্যা ও। সকলের চেয়ে সুন্দরী। দিদিরা বলত, বলত পড়শী মেয়েরা, 'অত রূপ নিয়ে রাজার ঘর আলো করবি গৌরী।' সে-কথা কত দিন ও ভেবেছে আর কল্পনা করেছে এক রাজপুত্রের। কিন্তু এখন ? এখন থেকে থেকে ওর মনে হয়—সেই সব মেয়েদের চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে সব দেখায়। দেখিয়ে বলে, 'দেখে যা মুখপুড়ীরা, কেমন রাজার ঘরের রাজরানী হয়েছি আমি।'

চেষ্টা-চরিত্র করতে করতে একটা টুইশনের কাজ পেয়ে গেল নির্মল। হেঁদোর কাছাকাছি একটা অঞ্চলে। মাস গেলে পঁচিশ টাকা। বেলেঘাটার ও-পাড়ায় শুধু একলা গৌরীই নয়, ওরও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল। মাস-খানেক বেলেঘাটা থেকেই যাতায়াত করল টুইশনিতে। কিন্তু তাতে যেমন দরকার সময়ের, তেমনি যাতায়াতের খরচ বাবদ মোটা অঙ্কটাই বেরিয়ে যায়। অনেক খুঁজে-পেতে শেষে রামদুলাল সরকার স্ট্রীটে এই বাসাটা ভাড়া করল নির্মল।

বেশ বড়-সড় এক খানা ঘর। সঙ্গে বাথরুম, পায়খানা, রান্নাঘর। ভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা। শুনে গৌরীও খুশী। খুশী হবার কথাই। ভাড়াটা একটু বেশি বটে, কিন্তু পাড়াটা ভদ্রপাড়া। সব কিছুই আলাদা। বেলে-

ঘাটার মতো সকাল-সন্ধ্যায় বারিবাহিনাদের দলে লাইন দিতে হবে না। ওখানকার পাঁচটা বাসার মতো বে-আব্রু লজ্জায় ঢাকা দেবার চেষ্টা করতে হবে না দারিদ্র্যকে। বরং বিকেলে-টিকেলে হেঁদোয় ঘুরে আসা যাবে। নির্মলের যাতায়াতের খরচ বাঁচবে, আর তা দিয়ে মাসে দু' একবার সিনেমা-টিনেমাও যে দেখা হবে না, তা নয়।

কিন্তু এ-বাড়িতে উঠে এসেই গৌরীর চক্ষু চড়কগাছ। এখানেও যে সেই একই ব্যবস্থা! পাঁচটা না হোক, পাশাপাশি দু'টো বাসা একই উঠোনের মধ্যে। বারান্দাও একটাই। বাড়িওয়ালা থাকে দোতলায়। নিচুতলায় দু'টো ঘরের মধ্যে একটাতে এক জন ভাড়াটে রয়েছে বউ নিয়ে। কল পায়খানা রান্নাঘর আলাদা যদিও, কিন্তু সেই বে-আব্রু ঝামেলা এখানেও রয়েছে। দেখে শুনে নির্মলকে বলল গৌরী, 'তা হলে বেলেঘাটা আর শ্যামবাজারের মধ্যে তফাৎটা কী?'

'অনেক তফাৎ' হেসে ফেলল নির্মল, 'অন্তত কয়েক মাইলের ব্যবধান তো বটেই।'

'সে-কথা জানতে চাই নি। এখানেও যে এক উঠোনে দুই বাসা!'

'হোক না। অসিতবাবুরা লোক ভাল। খুব ভদ্র। আমি আলাপ ক'রে দেখেছি।'

আলাপ অবশ্য গৌরীর সঙ্গেও হল। বউটিকে ভারি পছন্দ হয়ে গেল গৌরীর। সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি কথা, আর চমৎকার ব্যবহার। এক দিন নিমন্ত্রণ ক'রেও খাওয়াল বউটি। আলাপ আলোচনায় বন্ধুত্বে বেশ জমেই উঠল।

কোথায় যেন চাকরী করে বউটির স্বামী। ধোপদুরস্ত কাপড়-জামা পরে। ফিটফাট। আর ওই যে বউটি, মিনতি, সেও খুব সাজগোজ করে। তিন বেলাই খোঁজ-খবর করে। রান্না করতে বসলে এক ফাঁকে এসে দাঁড়ায়, বলে, 'কি দিদি, কী রান্না করছ?'

কড়াতে খুন্তি নাড়তে নাড়তেই তাকিয়ে হাসে গৌরী, 'এই আর কি।'

'তবু ভাল;' মিনতি পিঁড়ি টেনে বসে। 'তোমার কর্তাটি একেবারে

মহাদেব মানুষ। শাক-ভাত যা দাও চুপচাপ খায়। আর আমাদের উনি? তাঁর আবার নিত্য মুখ বদলানো দরকার। আজ মাছ হয়েছে তো কাল ডিম, পরশু মাংস।'

'তাই বুঝি?' শাকের ঘণ্ট নাড়তে নাড়তে আহত কণ্ঠে বলে গৌরী, 'আমার উনিও সে-দিক থেকে কম নয়। কিন্তু ভাই আমি আবার মাছ-মাংস খেতে ভালবাসি না। সেই জন্যই...'

সকালে, দুপুরে, বিকেলে নিত্য আনাগোনা। এ-টা টানে, ও-টা দেখে। বাজার আসবে তা ঘেঁটেঘুঁটে দেখবে। ঠোঁট উলটে বলবে, 'ও মা, কলমীশাক এত ভালবাস তোমরা! রোজ দেখি শাক খাও, একটু ভাল-মন্দ মাছ-টাছ...'

সহানুভূতির সুরে এই ব্যঙ্গ শুনে চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে গৌরীর। কিন্তু সংসারের সব কথা খুলে বলা যায় না। বলা যায় না যে, সে-সব আনবার সামর্থ্য নেই ওর স্বামীর। তবু সব কিছু লুকোতে চায় ও। তাই বিষণ্ণ একটু হাসি ঠোঁটের প্রান্তে টেনে এনে বলে, 'ক'দিন থেকে পেটের অবস্থা ভাল নেই ওঁর।'

'তা হলে শাক কেন?' বুঝেও না-বোঝার ভাণ করে মিনতি।

নাঃ, এ আর সহ্য করতে পারছে না গৌরী। কী দিয়ে ঢাকবে ও ওর সংসারের এই দারিদ্র্যকে? যত বেশি ঢাকতে চায় ও, তত প্রকাশ হয়ে পড়ে সব কিছু। একটু আব্রুর আড়ালে যে নিজের মনে সংসারের কাজকর্ম করবে, ঢাকবে সমস্ত ব্যর্থতার লজ্জা, তা আর হবার উপায় নেই এখানে। দিন দিন এই অপমানের জ্বালায় ওর কান্না আসে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না গৌরী। মনের আগুন দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে। আর আজ ঠিক সেই রকম একটা চরম অপমানে ওর মধ্যে বিশ্বধ্বংসী আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলছে। একটা ব্যবস্থা না ক'রে কিছুতেই ও স্নান করবে না। খাবে না। নির্মলের লুঙ্গির প্রান্ত শক্ত মুঠিতে চেপে চিৎকার ক'রে উঠল গৌরী, বলল, 'এখানে এমন ক'রে থাকতে পারব না আমি, পারব না। একটু স্বস্তিতে স্নান করব, কাপড় ছাড়ব, তার পর্যন্ত জো

নেই। তোমার ভালমানুষ লোকটার ড্যাব্‌ডেবে চোখ দু'টো গেলে দেব আমি হ্যাঁ।'

'অ্যাঁ!' দেহের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠল নির্মলের, 'বল কী!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হল তো? যাও, বাড়িওয়ালাকে বলে আজই পার্টিশন দিয়ে দিতে বল। নিস্তার পাই এ-সব ঝামেলা থেকে।'

সেদিন নয়। পর দিন সকালে জন-মজুর এল। মাল-পত্রও। পার্টিশনও উঠল। আর এইটুকু ব্যবধানের আড়ালে দুই পাশের দুই পরিবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। যদিও মনের মতো পার্টিশন হল না গৌরীর, যা হোক, তবুও প্রস্তুত হতে লাগল ও। হ্যাঁ, কাল। কালই মিনতির সব অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। রোজ রোজ ওর সংসার নিয়ে ওকেই কথা শুনিয়ে যাওয়া, আচ্ছা…

মাসের শেষ, ভারী টানাটানির সময়। তবুও দু'চার আনার বাজার না করলে চলে না। সবে বাজার এনে বারন্দায় রেখেছে নির্মল, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটনাটা ঘটল।

রান্নাঘর থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে এল গৌরী। ব্যাগটা উপুড় ক'রে জিনিসগুলো ঢালল। তারপর হঠাৎ যেন ফেটে পড়ল নির্মলের ওপর। চিৎকার ক'রে বলল, 'কী? কী ভেবেছ তুমি, শুনি? চিরটা কাল এমনি ক'রে দু'হাতে পয়সাগুলো ওড়ালে। সংসারে মানুষ তো মাত্র দু'জন, তা অত বড় একটা রুইমাছ দিয়ে হবেটা কী শুনি? ভূত-ভবিষ্যৎ বলেও কি চিন্তা নেই তোমার?' রোজ রোজ রুই মাছ খেয়ে খেয়ে…' কথাটা অর্ধ-সমাপ্ত রেখে কান খাড়া ক'রে কিছু শুনবার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল গৌরী।

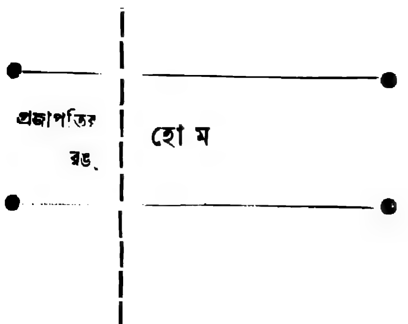
হ্যাঁ, মিনতির গলা। এ-রই জন্যই কান পেতে রয়েছে গৌরী। পার্টিশনের ও-পাশ থেকে মিনতির গলা শোনা গেল। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ওর স্বামীকে মিনতি বলছে, 'মাংস মাংস মাংস। বাবা-বাবা, রোজ রোজ এ আর ভাল লাগে না। বলি এরও তো একটা খরচ আছে? মাস গেলে অত-গুলো টাকা মাইনে পাও, তা রোজ রোজ মাংসের পিছনেই শেষ। তেল-

নুন-মশলা সব ডবল ডবল খরচা। হ্যাঁ, সাফ বলে দিলাম আমি, সঞ্চয় করতে শেখো। মাছ খাও গরিবদের মতো। তা নইলে পারব না আমি এ ঝক্কি বয়ে বেড়াতে।'

কথা নয়, মিনতি যেন একটা থাপ্পড়ই বসিয়ে দিল গৌরীর গালের ওপর। কিন্তু তবুও ঠোঁট উলটে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল গৌরী। হ্যাঁ, জানা আছে কার কত মুরোদ। ও এগিয়ে এল পার্টিশনের কাছে। বাঁশের চাটাইয়ের পার্টিশনের ফাঁক দিয়ে অনায়াসেই ও দেখে নিতে পারবে কেমন মাংসটা এনেছে মিনতির স্বামী। কিন্তু চাটাইয়ের ফাঁক দিয়ে দেখতে গিয়ে ভয়ানকভাবে চমকে উঠল গৌরী।

যে ছিদ্র-পথে তাকিয়েছে গৌরী, ঠিক তারই ও-পাশে, খুব কাছাকাছি একটা চোখ যেন মনে হচ্ছে! হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখল গৌরী, মিনতিও দেখছে ও-পাশ থেকে। দেখছে বারন্দার ওপর গৌরীর বাজার ছড়ানো রয়েছে। না, রুই মাছ নয়, কুমড়োর আধ-পাক ডগাপাতা আর গুটি কয়েক কলমী শাক।

কী লজ্জা! কী লজ্জা! যদিও গৌরী দেখল মিনতির বারান্দায় কিছু বুড়ো শক্ত ডাঁটার ডালপাতা আর কতগুলো কচুশাক ছড়ানো রয়েছে, কিন্তু তবুও কেন যেন হঠাৎ কান্না পেল গৌরীর। দু'চোখ জালা ক'রে জল নেমে এল। চোখাচোখি হয়ে যাওয়ার লজ্জায় মুহূর্তে ছুটে এসে রান্নাঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থরথর কাঁপতে লাগল গৌরী।



খানিক এগিয়ে অ্যাসফল্টের মাঝারি রাস্তা। প্রথমে বাজার তারপর আরও একটু এগুলে সেই শব্দ। বিশ্রী ঘর্-র্, ঘর্-র্ একটানা শব্দ। প্রথমটায় হকচকিয়ে চমকাতে হয়, কিন্তু আরও একটু এগিয়ে গেলে সেই অস্বস্তি ফিকে হয়ে আসে। সব দেখা যায়। দেখা যায় বলেই চমকাবার আর প্রশ্ন থাকে না, বরং তখন একটা কৌতূহল রৌদ্র-ছায়ার সম্ভাবনায় সতেজ হয়ে ওঠে মনের মধ্যে। বোধ্য, অবোধ্য পাঁচমিশালী কথার অস্পষ্ট গুনগুনানি, আর তা ছাপিয়ে দেহাতী ভাষার হুঙ্কার-হুমকি ঝনঝন ক'রে ওঠে। কিন্তু যন্ত্রদানবের সচল নির্ঘোষের কাছে মানুষের হুঙ্কার বা চিৎকার যেন ফিসফিস ক'রে কথা বলা ছাড়া কিছু নয়।

প্রথমে ঘর্-র্—ঘর্-র্, সর্-র্—সর্-র্, তারপর সরু কণ্ঠে শিস্ দেবার মতো টানা একটা শব্দ। সে-টা যখন বন্ধ হয়, অনেকগুলো মানুষের কণ্ঠ খানিকটা স্পষ্ট হয়। শোনা যায়। আস্তে-জোরে দেহাতী কথার কলরব। কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর আবার সে-শব্দ হারিয়ে যায় মোটর রেগুলেটর, চলন্ত করাতকল আর লগবোঝাই ট্রলি চলার শব্দে। এমনি ক'রেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কর্মমুখর প্লাইউড ফ্যাক্টরী তার সচল নির্ঘোষে মাত ক'রে রাখে এ-দিকটা ; এই তোর্ষা নদীর কাছাকাছি শান্ত জনপদটা।

যে-দিকে তাকাও—ছোট বড় পাহাড়। তা পেরিয়ে বড়, আরও বড়, আরও সুউচ্চ, একের পর এক পর্বতশ্রেণী দুর্বিনীত মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। তা ছাড়িয়ে দূরে দুর্লঙ্ঘ্য অভ্রংলিহ তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী। এ-জায়গাটা বাঙলা-ভূটান সীমান্ত। শৈলপুরী ভূটানের দুয়ার। ইংরেজী ভাষায় 'ডোর', আর তা থেকে ডুয়ার্স। শিলিগুড়ি পেরিয়ে আসাম লিঙ্কের গাড়িতে শেভক বাঁয়ে রেখে তিস্তার ও-পারে ছোট-খাট দু'একটা টানেল, তারপর বাগরাকোট স্টেশন। বাগরাকোট থেকে ওদলাবাড়ি, ডামডিম ছাড়িয়ে, মাল জংশন পেরিয়ে গাড়ির গতি কমে আসবে। চালসা, নাগরাকাটা, চ্যাংমারী, বানারহাট, দলগাঁও ছাড়িয়ে ট্রেন এসে দাঁড়াবে এখানে, এই মাদারীহাট স্টেশনে।

জ্যাক ম্যাথুজের সঙ্গে এখানেই আমার পরিচয়।

জ্যাক এই প্লাইউড ফ্যাক্টরীর কর্ম-কর্তা আর আমি টি-চেস্ট কণ্ট্রাক্টর। সুতরাং ব্যবসার খাতিরে, মাল কেনাবেচার খাতিরে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার পেছনে কোনো রোমাঞ্চ নেই। জ্যাক বিক্রেতা, আমি ক্রেতা। লগ থেকে প্লাইশীট বের করা ওর কাজ, আর সে-গুলো কিনে নিয়ে চায়ের বাক্স তৈরি ক'রে বাগানে বাগানে বিক্রী করা আমার কর্ম। তাই জ্যাক যেমন অসাধারণ নয়, আমিও এমন কিছু বিখ্যাত নই। কাজেই এ-পরিচয়ের পশ্চাতে কোনো রোমাঞ্চের কথা চিন্তা করাও অসম্ভব। তবু ওর চলা-ফেরা, কথা, গল্প-গুজবে এমন কিছু পেয়েছিলাম, যার জন্য ওকে আমার ভাল লাগত। সম্ভবত জ্যাকও ভালবাসত আমাকে।

বেশ লম্বা-চওড়া দেখতে। ফুট ছ'য়েক লম্বা। গায়ের রঙ্ পুরো সাহেবী না হলেও সাহেব বলে চিনতে ভুল হবার কথা নয়। আতেলা লালচে মাথার চুল, চোখের তারা দু'টো কপিশ। চোয়ালভারি থমথমে মুখখানা। ওর মুখের এই সদা-গাম্ভীর্য পেরিয়ে কদাচ হাসির ছিটেফোঁটা সম্ভাবনা কখনও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে কিনা সন্দেহ। তবুও কিন্তু জ্যাক ম্যাথুজকে ভাল লেগেছিল আমার। খুবই কাজের লোক ও। যেমন পারে খাটতে, তেমনি কুলি খাটাতে। সেই জন্যই বুঝি এই প্লাইউড ফ্যাক্টরীর প্রত্যেকটা মরদ

আর কামিন ভয়ানক ভয় করে ওকে। জ্যাককে ওরা বলে জীনসাহেব, বলে, 'উকার দেমাক বহোত হ্যায় কি, শেরকা মাফিক চলথে উ।'

বাঘ না হলে নাকি বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় না, কিন্তু ওদের ভাষার এই শেরের সঙ্গে অনায়াসেই মিশতে পেরেছিলাম আমি। শুধু মেলামেশাই নয়, জ্যাকের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম যে, পরবর্তীকালে এক মাত্র আমাকে ভিন্ন আর কাউকে বন্ধু বলে স্বীকার করতে ঘৃণা বোধ করত ও। সে সম্পর্ক হল পরে। আগে, প্রথমে যখন মাদারীহাট স্টেশনের ওপারে সেই প্লাইউড ফ্যাক্টরীতে ওকে দেখি, ব্যবসার কথা-বার্তা বলি, খানিকটা আমিও যে ভড়কে না গিয়েছিলাম, তা নয়। লোকটা শুধু এখানকার কর্ম-কর্তাই নয়, পাকা ব্যবসায়ীও। খরিদ্দার বশ করবার আশ্চর্য ক্ষমতা জ্যাক ম্যাথুজের। যদিও ওর কথাগুলো এমনিতে নিরস, রুক্ষ বলেই মনে হয়।

শুধু ব্যবসায়ীই নয়, ক্রেতা-বিক্রেতার ক্ষেত্রে একটা কথা প্রচলিত আছে। 'আজ নগদ কাল ধার।' কিন্তু ধার নয়, পর পর কয়েকবার নগদ লেন-দেন করার ফলে জ্যাকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলাম। সেই অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্যই হয়তো ওর বাংলো অবধি আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল একাধিকবার। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ওর স্ত্রীর সঙ্গে। তারপর থেকে যতবার এসেছি, ডিনার ব্রেকফাস্ট খেয়েছি জ্যাকের বাংলোয়। গল্প করেছি ওর স্ত্রীর সঙ্গে এক টেবিলে মুখোমুখি বসে। সেই গল্পচ্ছলেই এক দিন জ্যাককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা জ্যাক, এ-দেশ তোমার কেমন লাগে ?'

'ভারি সুন্দর', জবাব দিয়েছে জ্যাক, 'কিন্তু যাই বলো গুপ্ত, আমার হোমের মতো নয়।' কথা বলতে গিয়ে আপনিই চোখ বুজেছে জ্যাক। চোখ বন্ধ ক'রেই বলেছে, 'হাউ সুইট, লাভলি এণ্ড চারমিং। মাই হোম, সুইট সুইট।' তারপর চোখ খুলে তাকিয়েছে আমার দিকে, বলেছে 'আচ্ছা গুপ্ত, এই সব পাহাড়-পর্বত, শহর—সব বরফে ঢেকে গেছে কল্পনা করতে পারো ?'

'না।' অকপটে স্বীকার করেছি।

'তা হলে তুমি বুঝবে না। ভাবতে পারবে না ইংলণ্ড কেমন।'

দুই দেশের তুলনা প্রসঙ্গে জ্যাক আশ্চর্যভাবে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে ওর হোমের প্রশংসায়। বলেছে 'গুপ্ত, তোমাকে বোঝাব কি দিয়ে? কিন্তু এ-টা সত্য যে, সমস্ত পৃথিবী খুঁজলে এমন একটা দেশ পাবে না। সেই দেশই আমার হোম। আমার হোমের লোকেরা ইণ্ডিয়ানদের মতো অলস নয়। এ-কথাও তুমি স্বীকার না ক'রে পারবে না যে, যোদ্ধা বলতে পৃথিবীতে ওই একটা জাতকেই বোঝায়। অ্যাণ্ড ইংলণ্ড ইজ দি সেণ্টার অফ কালচার।'

নির্বাক শ্রোতার মতো জ্যাকের উচ্ছ্বসিত কথার স্রোত শুনেছি আমি। অন্য কেউ হলে কতটা সহ্য করতে পারতেন জানি না, কিন্তু মাঝে মাঝে এক-আধটু বিরক্ত হলেও খুব যে খারাপ লাগত, তা নয়। শুনতে শুনতে বরং অনেক সময় মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম জ্যাক ম্যাথুজের দিকে। মনে মনে ভাবতাম, ওরা ওদের দেশকে কত বেশি ভালবাসতে পারে। সাত সাগর পেরিয়ে এসে তাই ইংলণ্ডের গ্রামের ছেলে জ্যাক ম্যাথুজ একটি মুহূর্তের জন্যও ওর মাতৃভূমির স্মৃতি বিস্মৃত হয় নি, ভুলে যায় নি স্বজাতি গৌরবের কথা।

এক টেবিলে মুখোমুখি বসেও কিন্তু জ্যাকের স্ত্রীকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখি নি কোনো দিন। কোনো মুহূর্তেই নয়। খেতে বসে সে হয় খেত, না হয় পরিবেশন করত। দু' ক্ষেত্রেই কণ্ঠ তার অধিকাংশ সময়ে নির্বাক থাকত। অবসর সময় যখন গল্প গুজব হত, মিসেস ম্যাথুজ চুপচাপ সেলাই অথবা উল-বোনার কাজে ব্যস্ত থাকত। কথা বলতে বলতে, হোমের বিবরণ দিতে দিতে যখন উত্তেজিত হয়ে উঠত জ্যাক, তখনই মাঝে মধ্যে এক আধবার দু'টো একটা কথা শোনা যেত মিসেস ম্যাথুজের। কিন্তু বড় মেপেজুকে। যেন এর বাইরে ওর কিছু বলার নেই অথবা বলতে পারছে না। তবুও মিসেসকে দিয়ে কিছু বলাবার চেষ্টার কসুর করত না জ্যাক। এক একটা কথা বলে প্রায়ই ও ফিরে তাকাত স্ত্রীর দিকে, বলত, 'তাই

না ?' কোনো সময় আস্তে ক'রে মাথা নেড়ে সায় দিত মিসেস জ্যাক, আবার সময় সময় মনে হত জ্যাকের কথা আদৌ তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে কি না সন্দেহ।

এ-সব দেখে মাঝে মাঝে আমার চোখে বিস্ময়ের ঘোর লাগত। না লেগেই বা উপায় কি! ওদের স্বামী-স্ত্রী দু'টির মধ্যে আশ্চর্যজনক তফাৎ। জ্যাক উচ্ছল ঝরনার মতো চঞ্চল, প্রাণোচ্ছল। ঠিক যেন খরস্রোতা নদী। আর ওর স্ত্রী সে তুলনায় অনেক ম্রিয়মাণ, শান্ত, সমাহিত। বর্ষণোত্তর ঘুমন্ত রাত্রির নৈঃশব্দের সঙ্গে ওর তুলনা করা চলে। যত দেখেছি তত একটা দুর্বার কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে। হয়তো বা এর একটা অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য আমার মনকে আন্দোলিত করেছে একাধিকবার।

ব্যবসার খাতিরে এবং মাল-পত্র কেনাবেচার কাজে মাঝে মাঝেই ও-দিকে যেতে হয়েছে আমাকে। কাছাকাছি গোটাকতক চা-বাগানে বিলের টাকা আদায় এবং সেই সঙ্গে জ্যাকদের ফ্যাক্টরী থেকে প্লাইশীট কিনতে গিয়ে একাধিক রাত্রিকাল অবস্থান করতে হয়েছে ও-দিকে। প্রতিবারেই জ্যাকের আতিথ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। কিছুতেই ছাড়ে নি আমাকে। এক রকম টেনে-টুনেই নিয়ে গেছে ওর বাংলোয়, বলেছে, 'গুপ্ত, হও না তুমি বেঙ্গলী, কী আসে যায় তাতে? আফটার অল তুমি আমার ডিয়ারেস্ট ফ্রেণ্ড। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে নেশনের কোনো প্রশ্ন না থাকাই উচিত।'

অকুণ্ঠভাবে রাজী হয়েছি আমি। যদিও জানি ওর বাংলোতে যাওয়া মানেই ওর হোমের গল্প চুপচাপ হজম করা। তবুও গায়ে পড়ে ওকে উৎসাহ দেবার জন্য বলেছি, 'তোমার হোমের গল্প কিন্তু শোনাতে হবে জ্যাক।'

'নিশ্চয়।' তারপর এক সময় আমার দিকে চোখ তুলে বলেছে, 'আচ্ছা গুপ্ত, ডু ইউ লাইক ইংল্যাণ্ড?'

'নিশ্চয়ই', জ্যাককে উৎসাহিত করেছি। 'কিন্তু তোমার হোম তো কখনও দেখি নি আমি।'

'তা বটে,' বেশ খানিকক্ষন চুপচাপ থেকে জ্যাক বলত, 'তোমাকে আমি নিয়ে যাব গুপ্ত। তুমি দেখবে আমার হোম। দেখবে ইংলণ্ড কত সুন্দর।'

সেদিন বুঝি নি মাতৃভূমির নামে জ্যাকের এত উচ্ছ্বাস কেন! যদিও মাঝে মাঝে শুনতে ভাল লাগত, মন দিয়ে শুনতামও ওর কথা, তবুও মাঝে মাঝে কেন জানি না আমার মনে হত জ্যাকের কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা রয়েছে। অথবা নির্ঘাৎ ওর মাথার এক-আধটু গণ্ডগোল হয়ে থাকবে। মিসেস ম্যাথুজের নিশ্চুপ কণ্ঠ সে সন্দেহকে আরও দৃঢ় করত। মনে হত সম্ভবত সেই কারনেই মিসেস ম্যাথুজ এমন ক'রে নিশ্চুপ থাকে। আরও একটা সন্দেহ আমার মনকে মাঝে মাঝে দোলাত। ভাবতাম জ্যাক সুখী নয়। কী একটা গোপন রহস্য ওদের বিবাহিত জীবনে কঠিন কণ্টকের সম্ভাবনায় সমস্ত গোলাপী স্বপ্নকে ম্লান ক'রে তুলেছে। আর সেই জন্যই জ্যাকের মাথার ঠিক নেই।

এ-রকম সন্দেহ করারও একটা কারণ ছিল। মিসেস ম্যাথুজকে দেখে মনে হত সে জ্যাকের চেয়ে বেশ কিছু বড়। কত আর হবে জ্যাকের বয়স? বড় জোর পঁয়ত্রিশ বৎসর। কিন্তু এ-কথা সত্য মিসেস ম্যাথুজ চল্লিশের কোঠা ছাড়িয়েছে। খুব বেশি দিন না হলেও দু' এক বৎসর আগেই চল্লিশ পার হয়েছে তার। অন্তত সে-রকম চিহ্ন ওর চোখে-মুখে-দেহে দেখেছি আমি। শুধু বয়সই নয়, মিসেস ম্যাথুজ আশ্চর্য রকমের মেদ-বহুল। যেন চলাফেরা করাও ওর পক্ষে কষ্টসাধ্য। সে তুলনায় জ্যাক অনেক কৃশ।

এক দিন ওদের বাংলোয় থাকাকালীন কাছাকাছি একটা চা-বাগানের ইওরোপীয় ম্যানেজারের ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। জ্যাকের সঙ্গেই গেলাম। এই যাওয়ার পেছনে একটা উদ্দশ্যেও ছিল। জ্যাক বলেছিল, 'তার সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গতা আছে ম্যানেজারের। এবং অনায়াসেই ও-বাগানের টি-চেষ্ট কণ্ট্রাক্টটা ও আমাকে পাইয়ে দিতে পারবে। মোটা টাকার একটা কণ্ট্রাক্ট পেয়েও গেলাম। গল্প-গুজবে অনেকটা রাত হল ফিরতে। তিথি-নক্ষত্র মনে নেই, কিন্তু এ-টা মনে আছে, সেদিন আকাশের চাঁদ

প্রায় পূর্ণ গোলাকৃতি ছিল। একটু যেন বাড়াবাড়ি ছিল জ্যোৎস্নার! ফেরবার পথে একটা ব্রিজের ওপর জ্যাক ব্রেক কষে ওর 'মরিস এইট' কার-টা থামাল। দরজা খুলে নামতে নামতে বলল, 'গুপ্ত, এস, দেখে যাও।'

নেমে এলাম ওর পেছন পেছন। ভেবে পেলাম না রাত্রির এই মধ্য প্রহরে এমন কী ও আমাকে দেখাতে চায়!

জ্যাক সোজা নেমে এল ব্রিজের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝরনার পারে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। আকাশ পাহাড় ঝরনা। তারপর এক সময় আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'কী সুন্দর, কী উজ্জ্বল!' আমার দিকে তাকাল জ্যাক, 'গুপ্ত, দেখ। হুবহু আমার হোম। হ্যা, অদ্ভুত মিল।'

আমি তাকালাম। দেখলাম এ-দিক ও-দিক। কাছে-পিঠে পাহাড়। সুউচ্চ পাহাড়ের সারি। ঘন জঙ্গল। আর আকাশের সুনীল ব্যাপ্তিতে উজ্জ্বল চাঁদের রোশনাই। নিচে পাহাড়-জঙ্গলের ফাঁক-ঝোপ দিয়ে ব'য়ে আসা কলনাদিনী উচ্ছল ঝরনার একটানা শান্ত কুলু কুলু শব্দ। পাহাড়ের গায়ে গায়ে অজস্র সূর্যমুখী ফুলের নিষ্করুণ হাসির দ্যুতি যেন আরও সুন্দর করেছে জ্যোৎস্নার সমারোহ। থমথমে ঘন নৈঃশব্দের মধ্যে এই স্রোতস্বিনী ঝরনার অপূর্ব কলকাকলি কোথায় যেন টেনে নিয়ে যায় বন্দী মনকে। অদূর পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাহাড়ীদের দু' একটা কুটির থেকে নক্ষত্রের দ্যুতি ছড়িয়ে জ্বলে জ্বলে উঠছে আলোর কণিকা। অপূর্ব, অনুপম সেই রাত্রির দৃশ্য।

জ্যাক কথা কইল, বলল, 'জানো গুপ্ত, মাঝে মাঝে এমন ভুল হয়ে যায় আমার। মনে হয় এই আমার হোম, আমার ইংলণ্ড। কিন্তু'···কি যেন ভাবল জ্যাক, বলল, 'তোমার কেমন লাগছে গুপ্ত?'

'ওয়াণ্ডারফুল,' প্রায় গদগদ হয়ে উঠলাম আমি।

তারপর জ্যাক বসে পড়ল সেই বড় পাথরটার ওপর। আমার দিকে মুখ তুলে বলল, 'বসো গুপ্ত, অ্যাণ্ড ট্রাই টু ফিল মাই হোম।'

এ যেন জ্যাকের কণ্ঠ নয়। স্বদেশ থেকে নির্বাসিত কোনো এক দেশপ্রেমিকের করুণ কান্নার আকুতি। আমি বসলাম জ্যাকের পাশে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ নিঃশব্দে কেটে গেল। তারপর দু'টো একটা ভাসা ভাসা কথা। অনেক দিন ধরে পুরে রাখা সেই কৌতূহলকে কিছুতেই যেন চেপে রাখতে পারছিলাম না আমি। মনে হল আজই সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ। এখন কথাপ্রসঙ্গে অনায়াসেই দু'টো একটা কথার ঢিল ছুঁড়ে আলোড়নটা বুঝতে পারব। আর হয়তো তা থেকে এই রহস্যের একটা সমাধানের আঁচও পেয়ে যেতে পারি। ভাবছিলাম কোথা থেকে শুরু করব আর কোন্ কথার সূত্র ধরে আসতে পারব আসল প্রসঙ্গে। এক সময় মনের এই দ্বন্দ্বকে ঠেলে ফেলে দিয়ে জ্যাকের দিকে তাকালাম, জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত দিন আগে তুমি বিয়ে করেছ জ্যাক?'

জ্যাকের দৃষ্টি ছিল স্রোতস্বিনী ঝরনার দিকে। মনে হল আমার প্রশ্নে ও যেন একটু চমকাল। সহসা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল একটা মুহূর্ত, বলল, 'বিয়ে? ইউ মীন···তা এই ধর না কেন বছর দু'য়েক।'

কেন জানি না সঙ্গে সঙ্গে আর কোনো প্রশ্ন মনে গুছিয়ে উঠতে পারলাম না। কিন্তু জ্যাক সম্ভবত আমার কৌতূহল সম্বন্ধে কিছুটা আঁচ করতে পেরে বলল, 'ইয়েস, শী ইজ দি গার্ল অফ ইংলণ্ড। আমার হোমের মেয়ে ও। খাস লণ্ডনে ওর জন্ম, কিন্তু···' জ্যাকের মনেও বোধ হয় একটা প্রশ্ন। ও বলল, 'তুমি একটু অবাক হয়েছ, না গুপ্ত?'

এ যেন অপ্রস্তুত করতে বসে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'ন্—না। ঠিক মানে—'

মাথা নাড়ল জ্যাক, বলল, 'গুপ্ত, তুমি লুকোতে চাইছ আমি জানি। তা হলে শোন। শী ওয়াজ মাই—মানে ওর সঙ্গে একটা লভ্ এফেয়ারই ছিল আমার। বয়স একটু বেশিই বটে, বাট্ শী ইজ এ গুড লেডি। ও চায় জীবনে আমি উন্নতি করি, বড় হই।'

আরও কিছু অবান্তর কথা নিয়ে সময় কাটল। জ্যাক বলল,

ইংলণ্ডের মেয়েরা হচ্ছে যাকে বলে আদর্শ গৃহিণী। ওদের ওপর নির্ভর করা যায় অনায়াসে। আর ইংলণ্ডের ছেলে হয়ে হোমের মেয়েই যদি বিয়ে না করল, তবে কি সুখী হতে পারবে জ্যাক? মোট কথা ইংরেজ হিসেবে ওর নিজেরও একটা দায়িত্ব থাকা উচিত।

জ্যাকের কথায় খানিকটা বিস্ময় ছড়াল। অবাক হলাম আমি। শুধু আমি নই, অনেকেই জ্যাকের এ-কথা শুনে অবাক না হয়ে পারবেন না। বিয়ের ব্যাপারে কোনো ইওরোপীয়ের এ-রকম কর্তব্য বলে কিছু আছে, এর আগে জানা ছিল না আমার। তাই জ্যাকের কথাটা আমাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলল।

আরও দু' একটি কথা। তারপর জ্যাকের কণ্ঠে আবার সেই উচ্ছ্বাস। জ্যাক বলল, 'জানো গুপ্ত, আট বৎসর পার হয়ে গেছে অথচ দেশে আর যাওয়া হল না আমার, পারলাম না।'

বললাম, 'তোমার আর বাধা কিসের?'

'না-না,' মাথা নাড়ল জ্যাক, বলল, 'বললেই যাওয়া যায় না। একি আর চারটিখানি কথা নাকি যে হুট্ ক'রে চলে গেলাম?'

'নয়তো কি! হাতে-পায়ে ঝর্‌ঝরে মানুষ, দিব্যি বউ নিয়ে ফ্লাই করবে।'

'না-না,' মাথা নাড়তে নাড়তেই জ্যাক থেমে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, 'অনেক বাধা আছে গুপ্ত, অনেক বিপদ।'

'বিপদ!'

জ্যাক চুপ ক'রে থাকল, কথা বলল না সহসা।

তারপর আবার কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে গেল। রাত্রির নৈঃশব্দে কান পেতে শুনলাম স্রোতস্বতী ঝরনার কলনাদ। তাকালাম দূরে, পাহাড়ের শীর্ষদেশে। কী অপূর্ব অনাবিল শান্তি! আর তার মধ্যে হঠাৎ যেন এক ঝলক কান্না ছড়াল জ্যাক, বলল, 'সে অনেক, অনেক কথা গুপ্ত।' সহসা ও সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল, 'চল, অনেক রাত হয়ে গেছে।'

নিঃশব্দে উঠে এলাম জ্যাকের সঙ্গে।

আজ আট বছর পর সেই জ্যাক ম্যাথুজের দেখা পেলাম। সেণ্টাল অ্যাভেন্যু থেকে খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ম্যাডান স্ট্রীট দিয়ে এগুচ্ছিলাম ধর্মতলার দিকে, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। প্রথমটা মনে হল ভুল করলাম কি ? কে কাকে ডাকছে, কে জানে ! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই ডাক। অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। এমনই পরিচয় যে আট বৎসর পরেও শুনতে ভুল হবার কথা নয়। দ্বিতীয় ডাকের মাথায় ফিরে তাকালাম পেছন দিকে। কিন্তু কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না ! অথচ যে নামে ডাকল, একমাত্র জ্যাক ম্যাথুজ ভিন্ন ও নামে কেউ ডাকে না আমাকে। আবার মনে হল হয়তো বা ভুলই শুনে থাকব।

'গুপ্ত,' আবার সেই কণ্ঠস্বর। আর সঙ্গে সঙ্গেই সম্মুখে এসে দাঁড়াল জ্যাক। আমাকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাসে প্রায় চিৎকার ক'রে উঠল।

'তুমি !' একরাশ বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ল আমার কণ্ঠ থেকে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়ছে না ?'

'কেন নয় ?'

হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠল জ্যাক একেবারে আচমকা। আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় পড়ে যেতে যেতে কোনো রকমে সামলে নিয়ে বলল, 'তুমি সেই গুপ্ত, অ্যা, হাউ স্ট্রেঞ্জ !'

কিন্তু এমনভাবে, এমন অবস্থায় জ্যাককে দেখতে পাব, এ-কথা ঘুণাক্ষরেও কোনো দিন ভাবতে পারি নি। এখন, এই মুহূর্তে যেন নিজের চোখকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। বার বার মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই ভুল দেখছি আমি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম ওকে, দেখলাম পা থেকে মাথা পর্যন্ত চুল-চেরা বিচার ক'রে। আমার মনে হল আদপে সবটাই বুঝি স্বপ্ন।

একটু যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল জ্যাক। মনে হল কে যেন ডাকছে ওকে। কা একটা অশ্রুতপূর্ব নাম ধরে ডাকছে। কান পাতলাম। কিন্তু জ্যাক বা

ম্যাথুজ কোনোটাই নয়! জ্যাক কিন্তু দু' ডাকের মাথাতেই অস্থির হয়ে উঠল। প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতে যেতে বলল, 'জাস্ট্ এ মিনিট গুপ্ত, জাস্ট্ এ মিনিট—'

স্পষ্ট দেখলাম ডানহাতি একটা মোটর-গ্যারেজে ঢুকল ও। কয়েকটা ভাঙাচোরা মোটরগাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আর তার সারাইয়ের কাজ করছে জন-কয়েক লোক। কেউ বাইরে থেকে, কেউ সেই ভাঙা মোটরের নিচে শুয়ে।

সরাসরি ভেতরে ঢুকে গেল জ্যাক। ঢুকবার পূর্ব মুহূর্তেও আবার সেই ডাকটা স্পষ্ট শুনতে পেলাম। জ্যাক নয়, ম্যাথুজ নয়—জন। জন বলেই ডাকছে। জন! তবে কি ওর আর একটা নাম-টাম আছে না কি! হতেও পারে। হয়তো বা জ্যাকের ডাক নাম .জন। কিন্তু জ্যাক আর জনের প্রশ্ন বাদ দিলেও বিস্ময়ের ঘোরটা কিছুতেই কমছে না আমার। অবশেষে সেই জ্যাক ম্যাথুজকে এমন একটা গ্যারেজে দেখব, এ-যেন আমার স্বপ্নেরও অতীত। আকাশ-পাতাল ভেবেও কূল-কিনারা পেলাম না। অথচ এমনও তো হতে পারে, জ্যাক চাকরি ছেড়ে ব্যবসায়ে নেমেছে, খুলেছে এই গ্যারেজটা। আর নিজে হাতেও কাজ-কর্ম কিছু কিছু করছে। অথবা এমনও হতে পারে জ্যাকের গাড়িই সারাই হচ্ছে এখানে। এ-কথা ভাবতে গিয়ে আরও কতগুলো প্রশ্ন ভিড় ক'রে এল মনে। অত টাকা মাইনের চাকরি, এত সম্মান; সে সব ফেলে কোন দুঃখে জ্যাক এমন একটা ছোট্ট গ্যারেজ খুলে বসল! আর সামান্য একটা ডাকে ওর চোখে-মুখে অমন ক'রে স্পষ্ট হয়ে উঠল কেন ভয়-ভয় একটা ভাব!

বছর আষ্টেক আগে হঠাৎ এক দিন মাদারীহাটের সেই প্লাইউড ফ্যাক্টরীতে গিয়ে শুনলাম জ্যাক নেই। কোথায় গেছে, দেশে? ওর হোমে? না, তা নয়। যা শুনলাম, সে আর এক অবাক কাণ্ড। আশ্চর্য সংবাদ। মাদারীহাট প্লাইউড ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার জ্যাক ম্যাথুজ এখন ডাক্তার। শুধু ডাক্তার বললে ভুল বলা হবে, জ্যাক এখন মেটেলী ডিস্ট্রিক্টের গ্রুপ মেডিক্যাল অফিসার। বারোটা অথবা তারও বেশি কতগুলো

চা-বাগান নিয়ে এক একটা ডিস্ট্রিক্ট, আর সেই রকম ডিস্ট্রিক্টের মেডিক্যাল ইনচার্জ হয়েছে জ্যাক ম্যাথুজ। ও এখন দণ্ড-মুণ্ড বিধাতা। মেটেলা ডিস্ট্রিক্টের একাধিক চা-বাগানের ডাক্তারদের ভাগ্য-বিধাতা। কিন্তু কী ক'রে সম্ভব! কোন্ উপায়ে এ-রকম একটা আশমান-জমিন পার্থক্য এক হওয়া সম্ভব, খুঁজে পাই নি।

মাস দেড়েক পরে এক দিন দেখা হল। ইণ্ডং, নাগেশ্বরী আর ইয়ংটং চা-বাগানের কিছু বাকি টাকা আদায়ের ফিকিরে গিয়েছিলাম মেটেলীতে। মেটেলী বাজার থেকে গ্রুপ মেডিক্যাল অফিসারের বাংলো তেমন দূরে নয়। সামসিংয়ের রাস্তা ধরে খানিকটা এগুলেই বাঁ-দিকে পড়বে বাংলো। ইয়ংটং যাবারও ওই একই রাস্তা। কি মনে হল, সোজা গিয়ে উঠলাম গ্রুপ মেডিক্যাল অফিসারের বাংলোতে।

বেয়ারা নিয়ে গেল আমাকে। সাহেবের অফিসে বসিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে সে চলে গেল। এক্ষুনি এসে পড়বে সাহেব। এক কোণে একটা সোফাতে বসলাম। আরও জন তিনেক লোক রয়েছেন। তার মধ্যে দু'জন বাঙালী একজন ইওরোপীয়। তাঁরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, জ্যাক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। খুব তরতাজা মনে হল ওকে। কী একটা কাগজ অপেক্ষারত সাহেবের হাতে দিয়ে ফিরে তাকাতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি। দেখেই জ্যাক প্রায় লাফিয়ে ওঠে আর কি। ত্বরিতে এগিয়ে এসে আমার একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'হ্যাল্লো, গুপ্ত যে, তারপর?'

'এই দেখতে এলাম তোমাকে।'

'বেশ, বেশ।' অপেক্ষারত সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত হল জ্যাক। আমাকে বলল, 'এক মিনিট গুপ্ত, আমি কথাটা সেরে নি।'

সাহেব চলে গেল। এ-বার অপেক্ষারত দু'জন বাঙালীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে লাগল জ্যাক। কথাবার্তায় বুঝলাম, দু'জন বাঙালীর একজন কোনো এক বাগানের ডাক্তার। অন্য বাবুটি সেই বাগানের ফ্যাক্টরী-ইনচার্জ। ফ্যাক্টরী বাবুর ছেলের টাইফয়েড হয়েছে। বাগানের ডাক্তারটি রোগের কোনো

সুরাহা করতে না পেরে ম্যাথুজকে নিয়ে গিয়েছিল। গতকাল জ্যাক ম্যাথুজ রোগী দেখে এসেছে এবং আজ তার প্রেস্‌ক্রিপশন্‌ দেবার কথা। সেই সঙ্গে ডাক্তার অতঃপর কি ভাবে রোগীর চিকিৎসা করবে, সে নির্দেশও দেবে জ্যাক। ডাক্তারের সঙ্গে খানিকটা মেজাজী কথাবার্তা বলে জ্যাক ভেতরে গেল। মিনিট সাতেক পরে ফিরে এসে দু'খানা স্লিপ ডাক্তারের হাতে গুঁজে দিয়ে ফিরে তাকাল আমার দিকে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ডাক্তার, জ্যাক তাকে ধমকে বলল, প্রেসক্রিপশন এবং নির্দেশ দু'টো আলাদা ক'রে লিখে দেওয়া হয়েছে। অগত্যা ওরা পালাল।

ধপ্‌ ক'রে আমার পাশে বসে পড়ে ওর একখানা হাত প্রায় আমার কাঁধে তুলে দিয়ে জ্যাক বলল, 'তারপর গুপ্ত, খবর কি তোমার ?'

'খবর তো সব তোমারই জ্যাক,' বললাম আমি।

হোঃ-হোঃ- ক'রে হেসে উঠল জ্যাক, বলল, 'ঠিক ঠিক, খবর সবই আমার। কিন্তু তোমার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। যাক, ভালই হল কী বলো ? এস, ভেতরে এস।''

প্রায় টেনে-হিঁচড়ে ও আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। আমাকে হঠাৎ দেখে মিসেস ম্যাথুজ কিন্তু চমকে উঠল। দেখলাম চোখে চশমা দিয়ে কী সব ডাক্তারি বই নিয়ে ঘাটাঘাটি করছে আর লিখছে। তবুও মুখে একটু হাসির রেশ টেনে উঠে এল মিসেস ম্যাথুজ। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে করমর্দন ক'রে বলল, 'তারপর মিস্টার গুপ্ত, আছ কেমন ?'

'ভাল,' বললাম আমি।

জ্যাক আমাকে অনুরোধ করেছিল সে রাতটা যাতে ওদের সঙ্গে কাটাই আমি। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে। একে হাতে কাজ তার ওপর মিসেস্‌ ম্যাথুজকে খুব সুপ্রসন্ন মনে হল না। কেমন যেন অপ্রস্তুত অপ্রস্তুত ভাব। সে অবস্থায় ওদের ওখানে থেকে যেতে বাধল আমার। চলে এলাম ঘণ্টা দুয়েক পরেই। জ্যাক অবশ্য আপ্যায়নের ত্রুটি করে নি। কফি খাওয়াল, সাধাসাধি করল স্যাণ্ডউইচ। কফিটাই খেলাম আমি। যখন চলে আসি জ্যাক অনুরোধ করল একদিন যেন এসে ওদের সঙ্গে রাত কাটাই।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কুয়াশাচ্ছন্ন মনে হল আমার কাছে। টাইফয়েড কেসের রোগী, যার মর-মর অবস্থা, সে রোগী কাল দেখে এসে আজ প্রেসক্রিপশন দেওয়া, প্রেসক্রিপশন ভেতর থেকে লিখে আনা, মিসেস্ ম্যাথুজের ডাক্তারি বইপত্র নিয়ে মনোযোগ সহকারে ঘাটাঘাটি। এবং আমার উপস্থিতিতে অসন্তুষ্ট হওয়া—এর সবটা মিলিয়ে যেন একটা রহস্যের কুয়াশা। সব কিছুর মধ্যেই হয়তো রহস্যের গন্ধ পাওয়া আমার স্বভাব। কিন্তু ভুল ভাঙল আমার। সমস্ত ঘটনাটা পরে জানতে পেরেছিলাম।

আসলে জ্যাক ম্যাথুজ একজন বড় ডাক্তার। বিদেশের অনেকগুলো ডিগ্রীধারী অভিজ্ঞ চিকিৎসক। আগে বর্মা-মুল্লুকে ডাক্তারী করত। বোমার ভয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসে এ-দেশে। চট্ ক'রে পসার করা বা চা-বাগানে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পাওয়া কোনোটাই না হয়ে ওঠায় প্লাইউড ফ্যাক্টরীতে সাময়িকভাবে চাকরিতে বহাল হয়ে চেষ্টা চরিত্র ক'রে তবে গ্রুপ মেডিক্যাল অফিসার হতে পেরেছে। আসলে প্লাইউড ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের মত সাধারণ লোক নয় জ্যাক। কোন উদ্দেশ্য, বা কেন বর্মা বা ডাক্তারি ব্যাপারের সব কথাই আমার কাছে আগা-গোড়া লুকিয়ে রেখেছিল জ্যাক, জানি না। যাই হোক, সেই দেখাই জ্যাকের সঙ্গে শেষ দেখা। আর যাই নি ওদের বাংলোয়। কিন্তু একটা কথা সে-দিন জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম জ্যাককে, জ্যাক কি ওর হোমে গিয়েছিল এর মধ্যে, ইংলণ্ডে ?

আজ আট বৎসর পর আবার সেই জ্যাক ম্যাথুজের সঙ্গে দেখা এই ম্যাডান স্ট্রীটে। আশ্চর্যভাবে দেখা। মেটেলী ডিষ্ট্রিক্টের অতগুলো চা বাগানের ডাক্তারদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা সেই জাঁদরেল গ্রুপ মেডিক্যাল অফিসার আজ একটা ছোটখাটো গ্যারেজের মালিক! এ যেন সত্যিই অবাক কাণ্ড! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরনো কথা ভাবতে গিয়ে যেন সহ্য করতে পারছিলাম না জ্যাকের বর্তমান অবস্থা।

খানিক বাদেই জ্যাক বেরিয়ে এল। কেমন একটা অপ্রস্তুত গাম্ভীর্য ওর চোখে-মুখে থই-থই করছে। তা সত্বেও জ্যাক আমার সম্মুখে এসে হাসল। বেশ জোর ক'রেই হাসি টেনে আনল ঠোঁটের ডগায়, বুঝতে কষ্ট হল না আমার। ও বলল, 'কলকাতায় তুমি কতদিন আগে এসেছ গুপ্ত ?'

'অনেকদিন।'

'ওদিকে আর যাও নি ?'

'কোন্ দিকে ?'

'ডুয়ার্সে ?'

'না।'

তারপর চুপচাপ। জ্যাক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বার দুই আড়মোড়া ভাঙল অনিচ্ছাসত্বেও। হয়তো চেষ্টা ক'রেও খুঁজে পেল না এরপর ও কি বলবে, কোন কথা দিয়ে এই অপ্রস্তুত ভাবটাকে আড়াল করবে।

আমার অবস্থাও তথৈবচ। না পাচ্ছি কিছু খুঁজে, না তাকাতে পারছি জ্যাকের দিকে। মাত্র আটটা বৎসরের ব্যবধানে এ কী মানুষ হয়েছে জ্যাক ! বুঝতে পারছিলাম, উচ্ছ্বাসের মাথায় আমাকে ডেকে দাঁড় করিয়ে এখন ভয়ানক অপ্রস্তুত মনে করছে ও নিজেকে। এখন যেন আমাকে বিদায় দিতে পারলে ও বাঁচে। সম্ভবত সেই উদ্দেশ্যেই এক সময় মুখ খুলল জ্যাক, বলল, 'তারপর এ-দিকে কোথায় ?'

'একটা জরুরী কাজে।'

'ও', সরাসরি বিদায় দিতে পারল না জ্যাক।

আমি বিদায় হলেই ও বাঁচত। ওর চোখমুখের অভিব্যক্তি দেখে তাই মনে হল আমার। কিন্তু তবুও জ্যাককে ছাড়তে ইচ্ছা হল না আমার। হয়তো আমি কিছু জানতে চাই ওর কাছ থেকে। অনেকক্ষণ ইতস্তত ক'রে বললাম, 'চল একটু এগোই এ-দিকে।'

'সে কী, তোমার কাজ !'

'আজ থাক জ্যাক। এত দিন পরে দেখা পেলাম তোমার, চল গল্প-সল্প করা যাক।'

জ্যাক একবার নিজেকে ভাল ক'রে দেখল, বলল, 'চল।'

পাশাপাশি এগুতে লাগলাম। একটা ভাল রেস্তোরাঁয় বসে খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করব এই ইচ্ছা। যেতে যেতে দেখলাম, জ্যাক আর সেই জ্যাক নেই। কেমন একটা বার্ধক্যের ছাপ ওর সারা দেহে। আগের তুলনায় অনেক ম্রিয়মাণও।

বললাম, 'হোমে গেলে?'

'হোম!' অস্ফুট মৃদু আর্তনাদের মতো কথাটা বেরিয়ে এল জ্যাকের কণ্ঠ থেকে। থমকে একবার দাঁড়াতে গিয়েও দাঁড়াল না। চোখ দু'টো কুঞ্চিত ক'রে ও বলল, 'ইউ মীন ইংল্যাণ্ড?'

'হ্যাঁ।'

আবার খানিকটা অপ্রস্তুত অবস্থা। যতই ঢাকবার চেষ্টা করুক জ্যাক কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দেবে কি ক'রে? স্পষ্টই আমি দেখতে পেলাম ওর চোখেমুখে যেন এক দোয়াত কালি ছড়িয়ে পড়েছে।

ততক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ধর্মতলায় এসে গিয়েছি। সামনেই একটা রেস্তোরাঁ। ভাবলাম ওখানেই একটা কেবিনে বসে খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

প্রথমটায় ঢুকতে একটু ইতস্তত করল জ্যাক। আমি তাড়া দিলাম, বললাম, 'এস।'

'এখানে!'

'হ্যাঁ।'

'তার চেয়ে অন্য কোথাও…'

বললাম, 'কাছাকাছির মধ্যে এ-টাই ভাল।'

আর একবার নিজের চোখেই জ্যাক নিজেকে দেখল। ওর চোখ-মুখ থেকে সেই ছড়ানো কালির কালিমা মোছেনি এখনো। উঠে এল ও।

কেবিনে ঢুকে মুখোমুখি বসলাম আমরা। বয়কে খাবার আনতে বলে জুৎসই একটা প্রশ্নের জন্য তৈরী হতে লাগলাম। জ্যাক কিন্তু চুপচাপ স্থাণুর মতো বসে রয়েছে। কী এক দুর্বার ঝড় বইছিল ওর মনের মধ্যে।

আথাল-পাথালি অনেক চিন্তার জট কতখানি বিপর্যস্ত করছিল ওকে আমার বোঝবার কথা নয়। কিন্তু মুখ যদি মনের আয়না হয়, তা হলে হলপ্ ক'রেই আমি বলতে পারি, জ্যাক সশঙ্কিত হয়েই অপেক্ষা করছিল।

খাবার এল। তখনও আমরা মুখোমুখি বসা দু'টি প্রাণী নিশ্চুপ। কথার খেই হারিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় এলোমেলো সুতার প্রান্ত খুঁজে মরছি।

জ্যাক হাসল, বলল, 'গুপ্ত, তোমার খবর কী? সব ভাল তো?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি যেন কি ভাবছ বলে মনে হচ্ছে?'

'তোমার কথাই ভাবছি জ্যাক', বললাম আমি। 'তোমাকে এমন ভাবে দেখতে হবে আশা করি নি।'

জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল জ্যাক।

বললাম, 'তোমার হোম, হোমে যাও নি?'

মুহূর্তে আর একবার বিবর্ণ হয়ে গেল ওর মুখখানা। খানিকটা সময় নিল ও, বলল, 'থাক থাক, সে কথা তুলে আর ব্যথা দিও না আমাকে।'

আবার চুপচাপ। বিরিয়ানী আর রেজালার প্লেটে কাঁটাচামচ, ছুরির শব্দ, কফির পেয়ালায় টুং টাং—এই ক'রেই কাটল আবার খানিকটা নির্বাক গুমোট। আমি তাকালাম, দেখলাম জ্যাকের আকাশ-ছোঁয়া সেই মাথা যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে এই মুহূর্তে।

জানি না কোন্ কৌতূহল তখনও আমার মনে দুর্বার ঝড় তুলছে। আর অনেক, অনেক প্রশ্ন গুনগুনিয়ে উঠছে আমার মনের মধ্যে। তাই এক সময় জ্যাককে বললাম, 'তোমার মিসেসের খবর কী?'

জ্যাক মাথা তুলল না।

বললাম, 'মিসেস কেমন আছে?'

ভিজে গলায় এক ঝলক কান্না ছড়িয়ে জ্যাক বলল, 'ও কথা যেতে দাও গুপ্ত, যেতে দাও। শী ওয়াজ এ চীট্।'

'চীট্।'

'হ্যাঁ।'

তারপর জ্যাক সমস্ত ব্যাপারটাই খুলে বলল।

ওর আসল নাম জন প্যাট্রিক, জ্যাক ম্যাথুজ নয়। জ্যাক ম্যাথুজ বলে: এক জন খুব নামকরা ডাক্তার ছিলেন ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী চলে আসে কলকাতায়। কিছুকাল পরে জন স্বর্গীয় জ্যাক ম্যাথুজের বিধবা স্ত্রীর নজরে পড়ে। এবং দিনে দিনে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। শেষকালে জন বর্ণিত সেই লভ্-এফেয়ার্সে এসে দাঁড়ায়। মিসেস ম্যাথুজ সেই সময়ই সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলে লোভ দেখিয়েছিল জনকে। যদি সে ম্যাথুজ সাজতে রাজি হয় তো মোটা টাকা বেতনের একটা চাকরি তো মিলবেই, সেই সঙ্গে উপরি পাওনা হিসেবে পাবে মিসেস ম্যাথুজকে, গৃহিণীরূপে।

কথা শুনে জন কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করল, বলল, 'কী ক'রে তা সম্ভব ?'

মিসেস ম্যাথুজ আদ্যোপান্ত পরিকল্পনাটা খুলে বলল। বলল, ম্যাথুজের মৃত্যু সংবাদ ইণ্ডিয়াতে কারও জানবার কথা নয় অথচ তাঁর সমস্ত কাগজপত্র থেকে সব কিছুই মিসেস ম্যাথুজের কাছে রয়েছে। অতবড় ডাক্তারের একটা চাকরি হতে খুব বিলম্ব হওয়ার কারণ নেই। তা ছাড়া, তাড়াতাড়ি চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে ধরা-ধরি করবার ক্ষমতাও রয়েছে মিসেসের।

জন বলল, 'কিন্তু ডাক্তারি ? তার তো কিছুই জানি না আমি।'

অভয় দিয়ে মিসেস ম্যাথুজ বলল, ঘাবড়াবার কারণ নেই। জন না জানলেও মিসেস ম্যাথুজের কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে। তা ছাড়া, এমন চাকরির ব্যবস্থাই করা হবে যাতে শুধুমাত্র পরামর্শ দিলেই চলে যাবে। বই-পত্র রয়েছে, একান্ত প্রয়োজন হলে তা থেকেও সাহায্য পেতে কষ্ট হবে না।

ছোট-খাটো একটা কণ্ট্রাক্টরী ফার্মের সহকারী কার্যাধ্যক্ষের কাছে এ যেন একটা গোটা রাজত্ব আর রাজকন্যার লোভ। জন অনায়াসেই রাজি হয়ে গেল। দিন কয়েক ধরে স্বর্গীয় ম্যাথুজের নাম-স্বাক্ষর রপ্ত করল। তারপর কয়েক দিন ঘোরাঘুরি ক'রে মিসেস ম্যাথুজ বলল, 'চল এ-বার, ব্যবস্থা সব হয়ে গেছে।'

বিছানাপত্র বাঁধা-ছাদা হল, রীতিমত তালিমে তৈরী হয়ে জন প্যাট্রিক জ্যাক ম্যাথুজ হয়ে রওনা হলেন ডুয়ার্সের দিকে। রাস্তায় বেরিয়ে মিসেস ম্যাথুজ বলল, আগে তারা গিয়ে উঠবে মাদারীহাটে। সেখানে প্লাইউড ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের পদ পেয়েছে জ্যাক ম্যাথুজ। এ-টা সাময়িক ব্যবস্থা। এ-চাকরি মেলাতে কষ্ট হয় নি মিসেসের। এর পরের লক্ষ্য যা, তা পেতেও খুব বিলম্ব হবার কথা নয়, কারণ ধর-পাকড় করতে কোনো দিকেই কসুর করা হয় নি।

মাদারীহাটের প্লাইউড ফ্যাক্টরীর অধ্যায়টুকু আমার জানা। তারপর যখন ডিস্ট্রিক্টের গ্রুপ মেডিক্যাল অফিসার হয়ে গেল জ্যাক তখনও আসল বিপদটা মনে আসে নি। মাস ছয়েক কাটবার পর দেখা গেল, ব্যাপারটা যত সহজ মনে করা গিয়েছিল তত সহজ নয়।

মেটেলী ডিস্ট্রিক্টের বারোটা চা-বাগানের মধ্যে সবই বিলিতী কোম্পানীর। ম্যানেজাররাও সকলেই ইওরোপীয়। তাঁদের বাংলোয় কারও অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা করার রীতি গ্রুপ মেডিক্যাল অফিসারের। এ-ছাড়াও, কার্যক্ষেত্রে অনেক রকমের বিপদের সম্ভাবনা। সেখানেই বাধল যত গণ্ডগোল। মিসেস ম্যাথুজ তার ছদ্মবেশী স্বামীকে অভয় দিতে লাগল আর সমস্ত বিপদের বাধা পার হতে লাগল এক এক ক'রে। কিন্তু কত দিন? একদিন পালাতে হল ডুয়ার্সের সমস্ত মায়া কাটিয়ে। ফেরারী স্বামী-স্ত্রী উধাও হয়ে গেল।

কিলকট চা-বাগানের জাঁদরেল ম্যানেজার এলবার্ট বুকাননের পুত্র-হত্যার দায়। ব্ল্যাক-ওয়াটার-ফিভার রোগে একটা ভুল ইঞ্জেকশনের সত্যটা ধরে ফেলেছিল বানারহাট ডিস্ট্রিক্টের গ্রুপ মেডিক্যাল অফিসার জি. এস. গ্যাড্। গোপনে তদারক চলতে লাগল, আর সে-খবর সুচতুরা মিসেস ম্যাথুজকে আবিষ্কার করতে কোনো রকম কষ্টই পেতে হয় নি।

এর পরের অধ্যায়ের ইতিবৃত্ত সম্ভবত আরও দুঃখের, আরও বেদনার সেই মিসেস ম্যাথুজ একদা সরে পড়ল। ফেরারী অবস্থায় লুকোচুরি

খেলাতে খেলতেই অন্য এক সাহেবের কণ্ঠলগ্না হয়ে চলে গেল চিরকালের মতো। কোথায় যে গেল, সে-কথা আজও জানে না জন প্যাট্রিক।

জন বলল, 'জানো গুপ্ত, অনায়াসেই ওকে আমি ধরিয়ে দিতে পারতাম, হয়তো তাতে জড়িয়ে পড়তাম নিজেও, কিন্তু সে ভয় ছিল না আমার। শুধু ইংলণ্ডের মেয়ে, আমার হোমের মেয়ে বলেই ওর সব অপরাধ আমি মেনে নিয়েছি।'

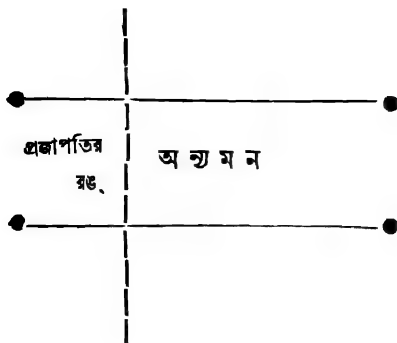
অনেকক্ষণ আগে বেয়ারা বিল দিয়ে গেছে। পকেট থেকে মনিব্যাগ বের ক'রে টাকাটা দিতে যাব, জন বাধা দিল, বলল—'না-না-না, সে হয় না গুপ্ত। আমি···মানে আমিই দিয়ে দিচ্ছি।' হাঁটু-ছেঁড়া তেল-কালি-মাখা জীর্ণ প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢোকাতে গেল জন। কিন্তু ওর কথা শুনি নি আমি। বিলের টাকাটা আমিই দিয়ে দিলাম। কতটুকু উপকার করতে পারলাম জানি না, কিন্তু এ-কথা সত্য, বিল শোধ করবার মতো অত টাকা জনের কাছে ছিল না। থাকলেও, ও-টাকা দিয়ে অনায়াসে ওর দিন কয়েকের খাই-খরচা চলে যাবে। কত আর কামাই করতে পারে সাধারণ একটা মোটর গ্যারেজের ক্লিনার—জন প্যাট্রিক?

একসঙ্গে পাশাপাশি বেরিয়ে এলাম দু'জনে। জন আজ ফেরারী আসামী। কিন্তু তা হলেও ও আমার কাছে জন নয়। যে জ্যাক ছিল ও, সেই জ্যাক বলেই চিরকাল মনে করব ওকে।

বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আর দেখা হয় নি জন প্যাটিকের সঙ্গে। কিন্তু ওর কথাগুলো আমি ভুলি নি। যদিও হোম-হোম ক'রে ও পাগল, কিন্তু কোনো কালেই ওর হোম দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। জনের বাবা বাঙলা দেশে এসে একটা বুড়ি নেপালী আয়াকে রেখেছিল। সেই আয়ার গর্ভেই জনের জন্ম। কিন্তু তা হোক, জনের বাবার দেহে ছিল খাঁটি ইংরেজের রক্ত। ইংলণ্ডেরই এক গ্রামের ছেলে জনের বাবা। তাঁর জীবিতকালে ইংলণ্ডের কত গল্পই না শুনেছে জ্যাক। চোখ বুঁজে বাবা যখন ইংলণ্ডের গল্প, ওঁর হোমের গল্প বলতেন, জনের মনে হত, ও যেন

চলে গেছে সেই স্বপ্নের দেশে, সেই আকাঙ্ক্ষিত ইংলণ্ডের গ্রামে। বাবার মৃত্যুর পর ও ভেবেছিল, একদিন না একদিন হোমে যাবেই, যাবে ওর মাদারল্যাণ্ডে। মিসেস ম্যাথ্‌জের প্রস্তাবে তাই অত সহজেই রাজি হয়েছিল জন।

এ-গল্প শেষ ক'রে জন আমার একটা হাত চেপে ধরেছিল, বলেছিল, 'গুপ্ত, ইট ইজ সিওর, আমি একদিন যাবই আমার হোমে। যেমন ক'রে হোক ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব। আর, হ্যাঁ, তোমাকেও নিয়ে যাব সে দিন।'



কিন্তু কিছুতেই একটা নিশ্চিন্ত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘর আর বারান্দা, বারান্দা আর ঘর, যতবার পায়চারি করছে অঘোরনাথ, যতবার ভাবছে, যেন আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ছে সে। অথচ সময় বসে থাকবে না। এগুবে। নিশ্চিন্ত গতিতে এগিয়ে চলবে।

এক বার লিখবার টেবিল ঘেঁষা তক্তপোষটাতে গিয়ে বসল অঘোরনাথ। গুটিকয়েক চুল নিয়ে মোচড় পাকাল কতক্ষণ। কলমটা নিয়ে হিজিবিজি আঁকল কাগজের ওপর ; আবার সে-সব ফেলে উঠে দাঁড়াল। ভেবে ভেবে মন স্থির করল। আর কোনো চিন্তা নয়, সোজা গিয়ে কথাটা বলতে হবে ছোট বৌদিকে। কিন্তু দরজার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়াল, ভাবল, না সে-কথা বলতে পারবে না, কিছুতেই নয়। বললেই যে ছোট বৌদি সঙ্গে সঙ্গে হাত উপুড় করবেন, তারও কোনো মানে নেই।

ঘুরে এসে আবার সেই টেবিল ঘেঁষা তক্তপোষটার কোণে বসল অঘোরনাথ। কিন্তু কতক্ষণ! যার মনের জ্বালা আগুনের সম্ভাবনায় ধিকিধিকি জ্বলছে, তার কি সুস্থির হবার জো আছে, না, নিশ্চিন্ত হবার পথ আছে?

সেই সকাল থেকেই এই পায়চারি পায়চারি খেলা চলছে। ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছে না অঘোরনাথ। অথচ সামান্য ক-টা পয়সার মামলা। ঢাকুরিয়া থেকে ডালহাউসি পর্যন্ত যাবার ভাড়াটা। কিন্তু চারটে ঘণ্টা

কোথায় দিয়ে যেন পার হয়ে গেল। ভাবা দূরে থাক মন স্থির ক'রে কারও কাছে যে চাইবে, সে-সাহসটুকু পাচ্ছে না অঘোরনাথ। যদি বা দু' একবার সাহস ক'রে এগিয়েছে, কিন্তু সংশয় এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি না দেয়, দু'টো কথাই যদি শুনিয়ে দেয়।

এ-সংসারে আশ্চর্যের কিছু নেই। ঠিক ভরসা পাওয়াও কঠিন। কিন্তু তাই বলে যে চার ছ'আনা পয়সা কারো কাছে নেই, তা নয়। আসল কথাটা হচ্ছে ওই মন আর সংশয়; যার নিষ্ঠুর খেলায় এই বেলা এগারোটা অবধি মুখে একটা বুলি পর্যন্ত ফোটেনি। অথচ ফোটা উচিৎ ছিল। কী আর হত দাদারা আফিসে যাবার আগে কয়েক আনা পয়সা চাইলে?

দেখতে দেখতে সময় এগুচ্ছে। এখনও এগিয়ে চলেছে। ওআল-ক্লকটার দিকে তাকাল অঘোরনাথ: চমকেই উঠল, অ্যাঁ সাড়ে এগারোটা! সর্বনাশ সময় ফুরিয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। কিন্তু ডালহাউসিতে যে তাকে পৌঁছতেই হবে।

কিন্তু পৌঁছব বললেই তো আর পৌঁছন যায় না। মানুষের এমন দু'টো পাখা নেই যে, পাখির মত হুশ ক'রে উড়ে যাবে। রাস্তায় বাস ট্রাম রয়েছে, সোজা রাস্তা বলতে শিয়ালদা পর্যন্ত ট্রেনে। তারপর ও-টুকু হেঁটেই পাড়ি দেওয়া চলতে পারে। কিন্তু গাড়ির ভাড়া সেই দু'আনা পয়সাই বা আসে কোত্থেকে? আর দু'আনা পয়সাই যদি চাইতে পারবে সে, তা হলে আর দু'আনা বাড়িয়ে বলতেই বা দোষটা কিসের? দেওয়া না-দেওয়ার প্রশ্ন আসছে পরে,- কিন্তু চাইতেই যে বাধ-বাধ লাগছে অঘোরনাথের। একটা কথা মনে পড়ল। কে যেন বলেছিল, তোমরা, মানে গায়করা বড্ড লাজুক।

হ্যাঁ, কথাটা খুবই সত্যি। বারান্দায় পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়াল অঘোরনাথ। একেবারে খাঁটি কথা, বর্ণে বর্ণে সত্য। তা যদি না-ই হবে, এই যে সে নিজে মনে মনে অর্ধশত লোক কল্পনা করল, ভাবল, এর কাছে না হোক আর এক জনের কাছে চাইলেই পাওয়া যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কল্পনাই সার হল। চাওয়া আর হয়ে উঠল না। বাড়িতে লোক

কম নেই। চার দাদা, বৌদিরা আর ভাইপো ভাইঝি নিয়ে প্রায় এক কুড়ি। কিন্তু থাকলে কি হবে আসলে চাইতেই যে পারছে না অঘোরনাথ।

ভাবতে ভাবতে চোখ দু'টো ভিজে এল অঘোরনাথের। ক'দিনেরই বা কথা। এই তো সেদিনও মা বেঁচেছিলেন। এই তক্তপোষটার কোণে বসে নিশ্চুপে মালা জপতেন। দরকার অদরকারে তার কাছে চাইতে বাধা ছিল না। আর কারও না হোক, অঘোরনাথের ব্যথা বুঝতেন মা। একটু মন ভার দেখলে কাছে বসে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কিরে পকেট বুঝি ঢু ঢু ?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিত অঘোরনাথ।

মালা জপা বন্ধ ক'রে পিঠে হাত বুলোতেন মা, 'তোকে নিয়ে হয়েছে আমার বিপদ। বয়স হল, একটা কিছু কাজে লেগে থাকলি না, বিয়ে করলি না।' তারপর আর বলতেন না। আঁচলের গিঁট খুলে গোটা একটা টাকাই তুলে দিতেন। পাছে ছেলের বউরা কেউ দেখে ফেলে তাই সন্তর্পণে টাকাটা হাতে গুঁজে দিয়ে জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন, 'আমার জীবনে আর দেখা হল না রে অঘোর। তুই দু'টো পয়সা কামাই ক'রে নিশ্চিন্দি হবি, তা দেখা আমার ভাগ্যে নেই।'

চার দাদা ভাল চাকরি করেন। একান্নবর্তী সংসার। প্রত্যেক দাদাই মাসের প্রথমে নির্দিষ্ট একটা টাকা তুলে দিতেন মা-র হাতে। তাই দিয়ে মা সংসার চালাতেন। সব ছিল মা-র হাতে। তা থেকেও দু'পাঁচ টাকা সঞ্চয় করতেন মা। লুকিয়ে ছাপিয়ে দিতেন অঘোরনাথকে। সে-দিক দিয়ে অঘোরনাথের কোনো চিন্তা ছিল না। পাঁচ জনের সংসারে একটা মানুষের চলে যায়। তাই সে-সব দিনগুলোতে অঘোরনাথ ছিল প্রাণোচ্ছল। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই ; ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে হৈ চৈ করত, ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলত বৌদিদের সঙ্গে, রাত্রিতে অনায়াসে একটা দু'টো অবধি আলো জ্বালিয়ে রেওয়াজ করা চলত। কিন্তু আজ ! ওই একটি লোকের অভাবে সব যেন ধোয়ামোছা হয়ে গেছে।

খাওয়া-পরাটা এখনও চলে বটে, কিন্তু আগের মতো সেই স্বাধীনতা আর দাবি নেই এ-বাড়িতে। সব যেন ছাড়া-ছাড়া। সে-হাসি

নেই। উচ্ছলতা নেই। যতক্ষণ বাসায় থাকে অঘোরনাথ, তানপুরাটা নিয়ে কাটিয়ে দেয়।

গান গেয়ে ক'টা পয়সাই বা পাওয়া যায় ? বিশেষ ক'রে নতুন গায়ক সে। মাসে, ন'মাসে দু'চারটে জায়গা থেকে ডাক আসে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তার মূল্য কতটুকু ? সংসারে এক পয়সা দেওয়া দূরে থাক, নিজের জামা-কাপড়টা পর্যন্ত হয়ে ওঠে না। চার ভাইয়ের একান্নবর্তী সংসার এখনও। দাদারা সব ভাগাভাগি ক'রে নিয়েছেন। কেউ বাজার করেন, কেউ বাড়িভাড়া দেন, ঠাকুর-চাকরদের মাইনে কেউ, বাকি সব আরেক জনের। এদের মধ্যে অঘোরনাথ উপরি। সকালে দু'কাপ চা আর দু'বেলা দু'মুঠো ভাত। এ-সংসারের সঙ্গে এইটুকুই সম্পর্ক তার।

দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে আবার তাকাল অঘোরনাথ। নাঃ, সময় যেন ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে। দু'টোর আগেই ডালহাউসিতে পৌঁছতে হবে। একটি চাকরির ইণ্টারভিউ আছে।

স্নানটা সেরে যা হোক করা যাবে, সেই ভেবে স্নান খাওয়া-দাওয়াটাও হয়ে গেল। নিষ্ঠুর ঘড়িটা টিক টিক ক'রে ঝড়ের বেগে সময় উড়িয়ে দিচ্ছে। দেখতে দেখতে সাড়ে-বারোটা বাজল। তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরল অঘোরনাথ। মুখটা মুছে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পৌনে একটা। আর বিলম্ব নয়। অনেক ভেবে চিন্তে উপায় স্থির হলেও কেমন বাধ-বাধ লাগছে। কিন্তু অনুপায়। অনুপায় অঘোরনাথ অবশেষে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

আজকাল হামেশাই লোক চলে যাচ্ছে। ধরাও বড় একটা কেউ পড়ে না। শেষকালে তা-ই করতে হবে। শিয়ালদা পর্যন্ত বেশ নিশ্চিন্তেই যাওয়া যাবে। গেটে ? লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের প্রায় সকলেরই মান্থলি টিকিট থাকে। তাই টিকিট থাকা সত্ত্বেও গেটে চায় না। একাধিকবার এ-রকম ব্যাপার অঘোরনাথেরও ঘটে গেছে। সুতরাং ওই মতলবই ঠিক।

পথ চলতে চলতে ঠিক মোড়ের মাথায় এসে থমকে দাঁড়াল অঘোরনাথ। বিপিনের দোকানটা খোলাই রয়েছে। বিপিনিও বসে রয়েছে যে! চাইবে

নাকি চার আনা পয়সা ? ওর দোকান থেকেই তো বরাবর বিড়ি, সিগারেট, মোমবাতি কেনে অঘোরনাথ নগদ পয়সায়। চার আনা পয়সা নগদ খদ্দেরকে অনায়াসে বিশ্বাস ক'রে দেবে বিপিন। কিন্তু দু'পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। নাঃ, যদি না দেয়, থাকতেও যদি বলে, না, নেই। একটা মোচড় খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল অঘোরনাথ। না, থাক। চেয়ে না পাওয়া গেলে তার চেয়ে অপমান আর নেই।

ট্রেনে বসে জানালা দিয়ে একবার ভাল ক'রে প্লাটফরমটা দেখল অঘোর-নাথ। বুকের ভেতর একটা অব্যক্ত আশঙ্কা ঢিব্ ঢিব্ করছে। ভয়ে ভয়ে দেখল। ট্রেনটা ছাড়তেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সে। কিছুক্ষণের জন্য অন্তত বাঁচা গেল। কামরার ভেতরে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতেই ছ্যাৎ ক'রে উঠল বুকটা। ঠিক সমুখের সীটে দু'টি মেয়ে বসে আছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে বার বার তাকাচ্ছে ওর দিকে। হাসছে। তবে কি বুঝতে পেরেছে ওরা ? ধরে ফেলেছে নাকি ডবলু-টির ব্যাপারটা ? তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাতে গিয়ে আবার একটা ধমক খেল অঘোরনাথ। দু'টো লোক কি যেন বলাবলি করছে অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে। তাকাচ্ছেও এ-দিকে। নাঃ, আর নয়, ওদিকে তাকাবে না সে। তাকালে ওদের সন্দেহটা বেড়েই যাবে।

একটা মাসিক পত্রিকা সঙ্গে এনেছিল সে। সেই বইটাই চোখের সমুখে খুলে ধরল। মন বসাতে চাইল বইয়ের পাতায়। কিন্তু চোখ দু'টো কিছুতেই বইয়ের পাতায় বন্দী থাকতে নারাজ। উদ্বেল মনটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। মনে হচ্ছে ঠিক পাশের ভদ্রলোক ফিস্‌ফিস্ ক'রে তাঁর সঙ্গীকে কী যেন বলছে। তা হলে। তা হলে ওরাও কী ধরতে পেরেছে নাকি ?

'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়।' বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়তেই ভয়ে কুঁকড়ে এল দেহের শিরা উপশিরাগুলো। বুকটা ঢিব্ ঢিব্ ক'রে উঠল। প্রচণ্ডতম একটা টাইফুন যেন গর্জে উঠল বুকের অতলে। এখন ? এখন কী উপায় হবে ? মান, সম্ভ্রম সব যাবে যে।

প্যাসেঞ্জারদের টিকিট চেক করতে করতে এগিয়ে আসছে টিকিট চেকার।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে এই দিকেই। সমস্ত আকাশটা যেন ভেঙে পড়ল মাথার ওপর। সর্বনাশ! কেউ যদি জানা-চেনা থাকে! ত্বরিতে আর একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিল অঘোরনাথ, দেখল সব ক'টা যাত্রিকে। চকিতে চোখ দু'টো আটকে গেল সম্মুখে। ঠিক ওপাশের মুখোমুখি সীটটায় যে দু'টো মেয়ে বসে আছে, ওরা যে অঘোরনাথের পাড়ারই মেয়ে। কিন্তু আশ্চর্য, এতক্ষণ সে চিনতেই পারে নি।

ত্রস্তে একবার উঠে যেতে যেতে বসে পড়ল অঘোরনাথ। টিকিট চেকার কাছাকাছি এসে গেছে। একেবারে নাগালের মধ্যে। আর মাত্র তিনটি লোক বাকি। এর পরই অঘোরনাথ। কিন্তু তারপর? তারপর সব ধরা পরে যাবে। ডবলু-টির চার্জে ধরা পড়বে অঘোরনাথ। আর সকলে মিলে হাসবে।

আর মাত্র দু'টি লোক। চেকারের চোখে চোখ পড়ে গেল হঠাৎ। তাড়াতাড়ি দৃষ্টি নামিয়ে নিল অঘোরনাথ। টিকিট হাতে চেকার খানিক তাকিয়ে রইল এই দিকে।

ধড়ফড় ক'রে উঠল বুকটা। ব্র্যাঞ্চ লাইনের এই চেকারগুলো ভয়ানক চালাক। বড় বেশি ধূর্ত। মুখ দেখে ডবলু-টির ব্যাপারটা ঠিক ধরে ফেলতে পারে ওরা।

মাঝখানে আর একটা মাত্র লোক বাকি। ভয়ে ভয়ে অসহায় দৃষ্টি তুলে তাকাতেই আবার চোখাচোখি হল। ভ্রূ দু'টো একটু কুচকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল চেকার। তাকিয়ে রইল অঘোরনাথের দিকে।

ছ্যাঁৎ ক'রে যেন আগুনের স্পর্শ লাগল বুকে। আর রক্ষা নেই, নিস্তার নেই ডবলু-টির চার্জ থেকে। সব বুঝতে পেরেছে চেকার। মনে হল এই মুহূর্তে লাফিয়ে পড়বে অঘোরনাথ, লাফিয়ে পড়বে চলন্ত ট্রেন থেকে। লজ্জা অপমানের হাত থেকে বাঁচতেই হবে তাকে। কিন্তু আর একটা মাত্র মুহূর্তের সময় না দিয়ে ঠিক সম্মুখে এসে দাঁড়াল চেকার। এক গাল হেসে বলল, 'তারপর? কোথায় যাওয়া হচ্ছে এ-দিকে?'

ভয়ানক ভাবে ভড়কে গেল অঘোরনাথ। চেকার যেন এক ঝলক শ্লেষের

আগুন ছড়াল! ইচ্ছে হল বলে, ধরেছেন যখন ন্যাকামির আর দরকার কী? কিন্তু মুখ ফুটে বেরুল না কথাটা। শুধু বলল, 'ডালহাউসিতে।'

'ভাল আছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি মানে—'

'চিনতে পারছেন না তো?' সঙ্গে সঙ্গে পাশে বসে পড়লেন ভদ্রলোক।

আমতা আমতা করল অঘোরনাথ বলল, 'চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু—'

'ওই তো মশাই আপনাদের দোষ। কল্পনার জগতের বাসিন্দা হলেন গিয়ে আপনারা।'

আর কোনো কথা নয়। একটা অন্তত বাঁচবার উপায় হয়েছে। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিল অঘোরনাথ। কালকের সিগারেটের প্যাকেটে এখনও দু'টো সিগারেট বাকি রয়েছে। প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে হাসবার চেষ্টা করল অঘোরনাথ, বলল, 'নিন।'

সিগারেট নিতে আপত্তি করলেন ভদ্রলোক, বললেন, 'সে কি! আপান হলেন গিয়ে নমস্য ব্যক্তি, মানে—'

'তাতে আর কী হয়েছে?' সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল অঘোরনাথ, 'বয়সে তো আমরা প্রায় সমান সমানই।' মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। যেমন ক'রেই হোক বন্ধুত্বটা অন্তত আজকের জন্য গড়তেই হবে, নিদেন পক্ষে চেনার অভিনয়টা তাকে সুষ্ঠুভাবে করতে হবেই।

একটা সিগারেট টেনে নিয়ে হাসলেন ভদ্রলোক, বললেন, 'পাপের ভাগী করলেন দেখছি।' তারপর সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আমার ঠিক মনে আছে কিন্তু। প্রথম বয়সে গান-বাজনার বাতিক এক-আধটু ছিল আমার। সেই জন্যই আপনার বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ক'বছরেরই বা কথা। কিন্তু আপনি দেখছি ভুলেই গেছেন!'

'না-না', বাধা দিল অঘোরনাথ, 'ঠিক মনে পড়েছে এ-বার।'

বেশিক্ষণ নয়, আর দু'একটা কথা বলতে বলতেই ট্রেনটা এসে ভিড়ল শিয়ালদা সাউথ স্টেশনে। চেকার উঠলেন, বললেন, 'চলুন।'

এক সঙ্গেই নেমে এগুল ওরা। কিন্তু যেতে যেতেই থমকে দাঁড়াল

অঘোরনাথ। সম্মুখে সাউথ স্টেশনের গেট। এ-বার, এ-বার তাকে রক্ষা করবে কে? কে বাঁচাবে?

চেকার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন, 'চলুন।'

অঘোরনাথ অনড়, অচল।

'কী হল?'

নিমেষে বিবর্ণ হয়ে গেল অঘোরনাথের মুখখানা, বলল, 'না, মানে—'

খপ্ ক'রে সহসা অঘোরনাথের হাতটা চেপে ধরলেন ভদ্রলোক। তারপর হোঃ হোঃ ক'রে উচ্চগ্রামে হেসে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় বজ্রাঘাত। এতক্ষণে জলের মতো সব স্বচ্ছ হয়ে গেল। সারা রাস্তা ন্যাকামী ক'রে, এ-বার শক্ত হাতে আসামীকে ধরেছে। এরপর যা ঘটবে সব যেন চোখের সম্মুখে ভাসছে। এরপর পুলিশের হাত, তারপর হাজত, তারপর—সমস্ত দেহটা এক লহমায় অবশ শ্রান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইল অঘোরনাথের।

জোর ক'রে টেনে নিয়ে চললেন চেকার। আর কোনো কথা নেই, অঘোরনাথের মনে তখন প্রলয় তাণ্ডব চলছে।

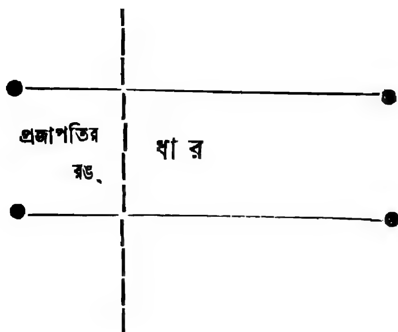
একটা মুহূর্তের মধ্যে যা ঘটে গেল একেবারে অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার। ত্রস্ত পায়ে প্লাটফরম ছাড়িয়ে পথে নেমে দাঁড়াল অঘোরনাথ। তবে কি জানতে পেরেছেন, বুঝতে পেরেছেন ভদ্রলোক! নিশ্চয়ই। পরিষ্কার বুঝতে পারিল অঘোরনাথ। তা না হলে গেট পার ক'রে দেবার সময় অমন ক'রে উনি হাতটা টিপে দিলেন কেন!

তবে কি কৃপা করলেন? কৃপা! ভাবতে গিয়ে সহসা লজ্জায় অপমানে মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল অঘোরনাথের।

ট্রাম বাস ট্যাক্সি আর মানুষের বিচিত্র কলরবের মধ্যে দাঁড়িয়ে পূর্বাপর ঘটনাটা ভাবছিল অঘোরনাথ। বাড়ি থেকে স্টেশন, ট্রেন এবং কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা। আর যাই হোক শেষ পর্যন্ত শিয়ালদা এসে

পৌঁছানো গেছে। কিন্তু বাকি পথটা? এখান থেকে ডালহাউসি পর্যন্ত অক্লেশে এবং বিনা পরিশ্রমে কি ক'রে যাওয়া যায়? কী ক'রে?

জনস্রোতের কলরব ছাপিয়ে বাস কণ্ডাক্টারের হাঁক শুনতে পেল অঘোর-নাথ। ট্যাক্সি কারের হর্ণ, এবং—এবং হঠাৎ একটা অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করতে পারল অঘোরনাথ। একটা সহজ সমাধানও বুঝি পেয়ে গেল এই মুহূর্তে। আর সঙ্গে সঙ্গে, এক লহমায় ভিড়ের চাপে শ্লথগতি পাশের ট্রামটায় সাঁ ক'রে উঠে গিয়ে ভয়ানক ভিড়ের মধ্যে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করল। ঢাকুরিয়া থেকে শিয়ালদহের তুলনায় ডালহাউসি তো কাছেই। খুব কাছে।



শ্যামবাজার থেকে কসবার এমন কী আর দূরত্ব ? কিন্তু দূরত্ব যত সামান্যই হোক এইটুকু পথ পাড়ি দেবার ইচ্ছা-পোষণ করা থেকে এখানে পৌঁছানো পর্যন্ত যত পরিশ্রম এবং মনোমালিন্য—সব মিলিয়ে যেন এক সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।

লাইন পেরিয়েই জিজ্ঞাসা আরম্ভ। না ক'রেই বা উপায় কী ? শ্যামবাজারের মানুষ সে কী ক'রে খোঁজ রাখবে কসবার পথ-ঘাটের ? কোনো দিন এ-দিকে এসেছে বলেও স্মরণ হয় না কুন্তলের। কাজে-কর্মে কখনও সখনও বালীগঞ্জ স্টেশন পর্যন্তই ছিল ওর দৌড়। তখন অবশ্য জানত, শুনেছিল, বালীগঞ্জ স্টেশনের রেল-লাইন পেরিয়ে সোজা যে পথটা চলে গেছে, ও-টাই কসবা পৌঁছবার রাস্তা। কিন্তু ওই জানা পর্যন্তই। লাইন পেরিয়ে কোনো দিনই ও-পারে যাওয়ার সৌভাগ্য হয় নি কুন্তলের।

ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। কসবার এ-এলাকাটা প্রায় নিস্তব্ধ, নিঃসাড়। ডাইনে বাঁয়ে দু'টো-একটা দোকানের ঝাপ খোলা, একটা দু'টো রিকসার ঠুন ঠুন—আর গোনা-গুনতি লোকের আনাগোনা। অথচ দু'পাশে একতলা দোতলা দালান আর খোলার চালের ঝুপসি বাড়ির সারি। তা থেকে একটা মুখও উঁকি দিচ্ছে না বারেকের জন্য।

নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সোজাসুজি আসতে পারল না কুন্তল। আরও বার দুই তিন জিজ্ঞাসা করেছে দু'এক জন পথচারীকে। পেরিয়ে এসেছে পাঁচ-সাতটা লেন, বাইলেন। তারপর আরও এগিয়ে এসে তবে হদিস মিলেছে আকাঙ্ক্ষিত রাস্তার। রঙ-চটা বিবর্ণ নামের ফলকটার দিকে তাকিয়ে মোছা, আধমোছা অক্ষর উদ্ধার ক'রে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে কুন্তল। ফলক থেকে রাস্তার নামটা উদ্ধার করতে একটু কষ্ট হলেও এই ফলকটিই এখন মরুদ্যানের মতো মনে হচ্ছে ওর কাছে।

কিন্তু নম্বরটা? হা হতোস্মি! যদিও পথের হদিস মিলল, কিন্তু কে জানবে যে ভুলের অন্ধকারে বাড়ির নম্বরটাও হারিয়ে যাবে! আতিপাতি ওপর নিচের পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে অবশেষে সন্ধান পাওয়া গেল সেই এক চিলতে কাগজের।

গলিতে ঢুকেই কেমন নিরাশায় ম্রিয়মান হয়ে পড়ল কুন্তল। কসবার পথে কোনো দিন না এলেও মোটামুটি একটা ধারণা ক'রে নিয়েছিল ও। নতুন গড়ে-ওঠা টালিগঞ্জের পাড়া এবং নিউ আলিপুর ঘুরে এসে ওর ধারণা হয়েছিল, কসবাও হয়তো এমনিই নতুনতর হয়েছে। গড়ে উঠেছে নতুন নতুন হাল-ফ্যাসানের বাড়ি, রাস্তা, পার্ক। কিন্তু বালীগঞ্জের রেলের লাইন পার হয়ে আসবার পর যত এগিয়েছে ততই যেন হতাশায় ভরে উঠছে মন। তবুও ক্লান্তি নেই কুন্তলের। ও আজ বদ্ধপরিকর হয়েই এসেছে।

পথ চলতে চলতেই বার বার মনে পড়েছে শেফালির কথা। আর সে-কথা ভাবতে গিয়ে বার বার ওর পা দু'টো জমে আসতে চাইছে কী এক দুর্বোধ্য জড়তায়। দোষ শেফালির নয়, হয়তো বা কুন্তলেরও নয়—তবু কোথায় যেন একটা মালিন্যের মরচে-ধরা কাঁটা অগ্নিবিন্দুর জ্বালা ছড়াচ্ছে। আড়াইটে মাস ধরে তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছে কুন্তল। আর জ্বালিয়েছে শেফালিকে। জীবনের এই নির্মম সত্যের মুখোমুখি এসে দাম্পত্য সম্পর্কের সুদৃঢ় ভিতে কখন যেন আস্তে চিড় খেয়েছে।

ডাইনে বাঁয়ে সতর্ক দৃষ্টি বুলোতে বুলোতে এক সময় থামল কুন্তল।

অবশেষে ও খুঁজে পেয়েছে বাড়িটা। কিন্তু কেন যেন তবুও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। নিজের চোখ দু'টোকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করতে কোথায় যেন বাধছে ওর।

খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে খানিকটা উঠোন দেখা যাচ্ছে। কে যেন নড়ছেও ওখানে! কাজ করছে। একটু এগিয়ে দেখতে গিয়েও পিছনে সরে এল কুন্তল। মনের কোথায় যেন একটা ইতস্তত ভাব দুর্বার হয়ে উঠছে। ডাকবে কি? কিন্তু কী নাম ধরে ডাকবে, জয়া না জয়ন্তী?

আড়াইটে মাস ধরে নিরঙ্কুশ জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎই মনে পড়ল জয়ন্তীকে। তার ফলে খানিকটা অত্যুৎসাহের চাঞ্চল্যে দুলে উঠেছিল মন। হ্যাঁ, যতদূর মনে পড়ছে জয়ন্তী কলকাতাতেই আছে। কিন্তু বিশাল এই কলকাতা শহরের কোন প্রান্তে, কোন গলি-ঘুপচির মধ্যে আত্মগোপন ক'রে আছে কে জানে? জয়ন্তীকে আজ খুবই প্রয়োজন। কুন্তল জানে না, জয়ন্তী আজও মনে রেখেছে কিনা ওকে। গেলেও চিনতে পারবে কিনা জানে না। একবার একটি মুহূর্ত যদি জয়ন্তী ভাল ক'রে তাকাতে পারে কুন্তলের চোখে, জয়ন্তীর মনে পড়বেই। পড়তেই হবে। জীবনের সব স্মৃতি সব সময় মুছে ফেলা যায় না।

খানিকটা নিরুৎসাহের এলোমেলো বাতাসে মনের পর্দা দুললেও রাত পোহাতে না পোহাতেই কী এই উৎসাহের আতিশয্যে আতিপাতি পুরনো চিঠিপত্রের জঞ্জাল ঘাঁটছিল কুন্তল। জঞ্জাল হলেও এরই আড়ালে পুরনো স্মৃতির কিছু মনি-মুক্তো ছড়ানো রয়েছে। আর তারই সন্ধানে ও এলোমেলো ঘাঁটছিল সেই চিঠিগুলো।

খুব একটা কষ্ট করতে হল না। অতি সহজেই জয়ন্তীর লেখা একখানা চিঠি পাওয়া গেল। আজ থেকে দু'বছর আগে লেখা। তার দিন পনেরো আগেই হঠাৎ এক দিন অফিস ফেরতা জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা। ভবানীপুর থেকে কসবায় বাসা বদলের কথা তখনই বলেছিল জয়ন্তী, কিন্তু নিজের অত বড় বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কসবার মতো জায়গায় যাওয়ার পেছনে জয়ন্তীর স্বামীর কী উদ্দেশ্য, সে-কথা ও জিজ্ঞাসা করতে পারে নি। অথচ এই

জয়ন্তীই এক দিন তার বিয়ের পর কোনো এক বাসন্তী বৈকালে লিখেছিল, "স্বার্থপর ভেব না। দুনিয়ার নিয়মই হয়তো এই। তোমার দিকে না তাকিয়ে ভুল করলাম কিনা জানি না, কিন্তু এখন দেখছি কুন্তল, জীবনের অনেক ভুলও ফুল হয়ে ফোটে। মনের প্রশ্ন বাদ দিলে অর্থের দিক দিয়ে প্রচুর পেলাম আমি।"

জীবনের এই নিরঙ্কুশ নিঃস্বতার মধ্যেও বেদনার আঁচড় কাটতে ছাড়ে নি শেফালি। সাত-সকালে হঠাৎ রুখে এল ও। ক্রুদ্ধ সার্পিণীর মতো ফুঁসে উঠল, 'কী, কী করছ ও-সব নিয়ে?'

'না-না, মানে...' ভড়কে গেল কুন্তল। ততক্ষণে ঠিকানাটা লুকিয়ে ফেলেছে ও।

'না!' টান-টান দাঁড়িয়ে থরথর কাঁপতে লাগল শেফালি। 'কিছুতেই কি স্বভাবটা বদলাতে পারব না তোমার?'

'কিসের?' অবুঝের ভান ক'রে চোখ তুলল কুন্তল।

'কিসের নয় তাই শুনি? এ-দিকে দু'মুঠো ভাতের জোগাড় করতে পার না, অথচ বান্ধবীদের প্রেমপত্তর ঘাঁটতে তো খুব উৎসাহ?'

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কুন্তল। কোথায় যে শেফালির বেদনা, কোথায় যে ওর কান্না, তাও জানে কুন্তল, কিন্তু জানলেও সব সমস্যার আশু সমাধান হয় না। মানুষ যত হারাতে থাকে, বেদনায় অস্থির হয়ে ততই সে আঁকড়ে ধরতে চায়। তা নইলে সামান্য ক'টা চিঠি-পত্রের ওপর এমন সন্দেহ কেন শেফালির? সব হারাতে বসেও কেন ও এমন ক'রে জড়াতে চায়?

চিঠি-পত্রগুলি গোছাতে গিয়েছিল কুন্তল। আর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে সবগুলি চিঠি ছোঁ মেরে নিল শেফালি। বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দ্রুত নিশ্বাসে ওর বুকটা ওঠা-নামা করছে। সম্মুখে দাঁড়িয়ে রাগে অভিমানে ও ফুলছে, ফুঁসছে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ', আরও কাছে সরে এল শেফালি, 'তার চেয়ে গলা

টিপে মেরে ফেল আমাকে। জুড়াক, সব জ্বালা জুড়িয়ে যাক।' সঙ্গে সঙ্গেই হাউ হাউ কান্নায় ভেঙে পড়ল শেফালি।

বিশ্রী গুমোট গরম আর দুরু দুরু সংশয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছিল কুন্তল। স্বর্গের সিঁড়ি ওর সম্মুখে, কিন্তু তবুও কেন যেন ও বার বার মুষড়ে পড়ছে। তবে কি ফিরে যাবে? না-না-না। যেমন ক'রেই হোক, জয়ন্তীকে যে আজ ওর বড় বেশি প্রয়োজন। সাহস সঞ্চয় ক'রে অবশেষে পা বাড়াল কুন্তল।

প্রথমটা অবাক হওয়ার পালা। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে নির্বাক বিস্ময় ছড়াল। তারপর বিস্ময়ের ঘোর যখন ফিকে হয়ে এল, জয়ন্তীই কথা কইল আগে। পথ দেখিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে যেতে জয়ন্তী বলল, 'সত্যি আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না কুন্তল।'

'না করাটাই স্বাভাবিক। বিশ্বাস বোধ হয় কোনো দিনই করতে পার নি আমাকে।' হাসল কুন্তল।

'ও-টা তোমার ভুল।' থমকে দাঁড়িয়ে ডাগর চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে বলল জয়ন্তী, 'পুরনো দিনের কথাগুলো এক বার ভেবে দেখ তো।'

হাতঘড়ির দিকে তাকাল কুন্তল। বেলা তিনটে। বিকেলের এখনও অনেক দেরি। ঘামে নেয়ে উঠেছে সমস্ত শরীর। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠবার সময় অস্পষ্ট আলোয় জয়ন্তীর দিকে ভাল ক'রে তাকাতে গিয়ে আহত হল কুন্তল। জয়ন্তী কি কাঁদছে? এ কী চেহারা হয়েছে জয়ন্তীর! সেই ফুলের মতো কমনীয় এক ফোঁটা মেয়ে সামান্য ক'টা বছরের মধ্যে এমনও হতে পারে!

শোবার ঘরে এসে থামল জয়ন্তী। কোণ থেকে চেয়ারটা টানতে টানতে বলল, 'তবু যে মনে পড়েছে এই আমার ভাগ্য।'

হাসবার চেষ্টা করল কুন্তল। বলল, 'মুছে ফেলতে চাইলেই কি সব মোছা যায়?'

'যায় না বুঝি ?' ঠোঁটের ডগায় ঝক্‌মক্ হাসির দ্যুতি ছড়িয়ে বলল জয়ন্তী, 'তা হলে দাগটা বেশ জোরেই পড়েছে, কী বল ?'

'নিশ্চয়ই।' পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে হাওয়া খাওয়ার চেষ্টা করল কুন্তল, বলল, 'একটা পাখা-টাখা থাকে তো দাও না। যা গরম।'

সঙ্গে সঙ্গেই পাখা নিয়ে এল জয়ন্তী। নিজেই হাওয়া করতে লাগল কুন্তলকে। বলল, 'একটু আরাম ক'রে বসো। জামা-টামাগুলো খুলে ফেল। ঘেমে তো নেয়ে উঠেছ একেবারে।'

'থাক', বাধা দিল কুন্তল। হাত বাড়িয়ে বলল, 'পাখাটা দাও তো আমার হাতে।'

'কেন ?' পাখা থামাল জয়ন্তী। 'আমার হাতের হাওয়াতেও কি দোষ আছে নাকি ?'

'তা,' এক মুহূর্ত নিঃশব্দ থেকে কুন্তল বলল, 'হতেও তো পারে।'

'ইস ! দেখি', পাখাটা বিছানার ওপর রেখে উঠে এল জয়ন্তী। পট্‌পট্ ক'রে কুন্তলের জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলল, 'কেমন সাধুপুরুষ জানা আছে আমার।'

'তাই নাকি ?'

'তবে ? মনে পড়ে না ?'

মনে পড়বারই কথা। এক সময় একই অফিসে চাকরি করত ওরা। আলাপের সূত্রপাত সেখানেই। দিনে দিনে ঘনিষ্ঠতাও। এবং ভালবাসা। সত্যি কথা বলতে কি, সেই যে-দিন সমস্ত সম্পর্ক আর বন্ধন কাটিয়ে অনায়াসে জয়ন্তী রথীন সেনের মতো বড়লোকের ঘরণী হল—রাগ, দুঃখ এবং অভিমান কম হয় নি কুন্তলের। কিন্তু কোনো শূন্যস্থানই অপূর্ণ থাকে না কোনো দিন। তাই কুন্তলের শূন্য হৃদয়ের স্থানটুকু পূরণ হল শেফালিকে ঘরে এনে। মাঝে মাঝে তাই বলে যে জয়ন্তীর কথা একেবারেই মনে পড়ে নি তা নয়; কিন্তু বছর দু'য়েকের মাথায় জয়ন্তী নামের কোনো বিদ্যুৎ-চমকই ওর মনের আকাশে ঝক্‌মক ক'রে ওঠে নি। তবুও আজ

অস্বীকার করবে না কুন্তল, সত্যিই জয়ন্তীকে আজ ওর ভীষণ প্রয়োজন, বড় দরকার।

আজ এই মুহূর্তে যতই রসিকতা করুক না কেন সে, সবটুকুই কষ্ট ক'রে অভিনয় করতে হচ্ছে ওকে। সময় যত এগুচ্ছে, তত বেশি উদ্বেল হয়ে পড়ছে কুন্তল। যতটা উৎসাহ নিয়ে জয়ন্তীর ঠিকানা খুঁজেছে, যে উদ্দীপনা নিয়ে ও ছুটে এসেছে কসবার এই গলিতে, কেন যেন সে উৎসাহ-উদ্দীপনার জ্যোতি ম্লান হচ্ছে ক্রমশ। কোথায় যেন একটা নিরাশার সম্ভাবনা দেখে বার বার মুষড়ে পড়ছে কুন্তল।

কিন্তু দমলে তো চলবে না। যে শূন্যপাত্র নিয়ে আজ ও জয়ন্তীর দুয়ারে প্রার্থী, তা পূর্ণ করা ওর চাই-ই চাই। শূন্য মনে প্রেমের গুঞ্জন নয়, অথবা হৃদয়ের রিক্ততা পুরণের জন্য জয়ন্তীর স্পর্শ যাচঞা করতেও আসে নি কুন্তল। ও কিছু চায়। হ্যাঁ, কয়েকটা টাকার বড়ই প্রয়োজন। চাকরি থেকে ছাঁটাই হবার পর একটা মাস কোনো রকমে সঞ্চিত অর্থে কেটেছে। তারপর শেফালির ছোটখাট, দু'টো একটা গহনা বিক্রি আর বন্ধু-বান্ধবের ধারের ওপর কেটেছে কিছু দিন। এখন ও নিঃস্ব। একমাত্র সম্বল বিয়ের পাওয়া ঘড়িটি। ও-টাই বিক্রি করত কুন্তল কিন্তু মন চায় না।

নিঃস্বের মতো রিক্ততার বেদনা এবং বিষণ্ণতা ছড়িয়ে তাকাল কুন্তল। জামাটা খুলে নিয়েছে জয়ন্তী। টাঙিয়েছে দেওয়ালের পেরেকে। হাত-ঘড়িটা খুলতে খুলতে বিজয়গর্বের হাসি হেসে জয়ন্তী বলল, 'দামী ঘড়িটা ঘামে নষ্ট হবে। নাও, এ-টা এখানে রেখে একটু বিশ্রাম কর তো।'

'তা মন্দ নয়,' বালিশ জোড়া টানতে টানতে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল কুন্তল, বলল, 'আর কাউকে দেখছি না যে?'

'কাকে?' জেনেও না জানার ভান করল জয়ন্তী।

'রথীনবাবু।'

'ও,' চোখের দৃষ্টিতে চমক খেলিয়ে হাসল জয়ন্তী, 'কেন? তাকেও কি প্রয়োজন নাকি?'

'না-না,' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল কুন্তল।

প্রয়োজন! তবে কি জয়ন্তী বুঝতে পেরেছে নাকি? জানতে পেরেছে নাকি কুন্তলের আগমনের হেতু? হঠাৎ ওর বুকের ভেতরটা ধ্বক ধ্বক ক'রে কেঁপে উঠল কী এক আশঙ্কায়। নিজেকে আড়াল করবার দুর্বার চেষ্টা ক'রে বলল, 'না, দেখছি না কিনা, তাই।'

জয়ন্তী কি লুকোতে চাইছে? ওর স্বামীর কথা উঠতেই সহসা ওর-মুখ চোখে ফ্যাকাশে বিষাদের কালো মেঘ থমথম ক'রে উঠল যেন। যার বিপুল অর্থের আকর্ষণে জয়ন্তী নিজেকে সঁপে দিয়েছিল, সেই রথীন সেনকে কেন্দ্র ক'রে কী এমন রহস্য থাকতে পারে?

বিছানায় গড়াগড়ি খেতে খেতেই বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়িটা দেখল কুন্তল। তিনটে পঁয়তাল্লিশ। দুপুরের দাহ খানিকটা শীতল হয়ে এসেছে। জয়ন্তী গেছে ভেতরে। হয়তো বা চা-জলখাবারের আয়োজন করছে। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে কেমন একটু তন্দ্রার ঘোরে ভারী চোখের পাতা দু'টো বুঁজে আসছে ক্রমশ।

আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল মাথার কাছে খস্‌খস্ শব্দে। চমকে উঠে বসল কুন্তল।

জয়ন্তী। অপ্রস্তুত, ফ্যাকাশে ঠোঁটের ডগায় হাসির লালিত্য ফোটাবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে জয়ন্তী বলল, 'বাব্বা, এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলে!'

'হ্যাঁ,' অপ্রস্তুতের মতো হেসে নামতে যাচ্ছিল কুন্তল।

'থাক-থাক, বসো', বাধা দিল জয়ন্তী, 'ওখানে বসেই না হয় গল্প করা যাক। এই নাও,' চায়ের কাপ এগিয়ে দিল জয়ন্তী, 'খেয়ে নাও।'

'তুমি?'

'আমি?' আবার ফ্যাকাশে হাসির ধূসরতা। 'ও-সব পাট চুকে গেছে কুন্তল। ছেড়ে দিয়েছি।'

চুপ করল কুন্তল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তাকাল জয়ন্তীর দিকে। বলবে নাকি এইবার? শুধু মাত্র গোটা কয়েক কথা।

গোটা দশ-পনেরো টাকা অনায়াসে দিতে পারবে জয়ন্তী। নিরাশ করবে না ঠিক।

বালিশের ওপর ভর দিয়ে কাছাকাছি আধশোয়া হয়ে বসল জয়ন্তী। ওর শাড়ির আঁচলটা কুন্তলের কোলের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে। কথা বলতে বলতে ডান হাতে বারবার কানের কানবালাটা নাড়ছে।

চা খেতে খেতে বারবার তাকাচ্ছে কুন্তল। মনের মধ্যে প্রস্তুতির প্রাণপণ প্রয়াস চলছে ওর। এইবার। এই হচ্ছে মাহেন্দ্রক্ষণ। নিলে যে আর দেবে না, এমন তো কথা নয়। সুদিন এলে অনায়াসেই টাকা ক'টা ফেরৎ দিয়ে দেবে। হাজার হলেও ধারের ব্যাপার। মেরুদণ্ড সোজা ক'রে টানটান হয়ে বসল কুন্তল। হ্যাঁ, এ-বার চাইতেই হবে।

সন্ধ্যা হয় হয় প্রায়। জানলা পেরিয়ে এক টুকরো আকাশে বৈকালী বিষন্নতা দেখল কুন্তল। সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই বলল, 'অফিসে বেরুও নি আজ ?'

'অফিসে !' খানিকটা বিস্ময়ের ছায়া জয়ন্তীর চোখে। 'না, নেই।' মাথা ঝাঁকিয়ে ক্লান্তি ছড়িয়ে বলল ও। এমন ভাবে বলল যেন এক ঝলক কান্না ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল জয়ন্তী। ম্লান দৃষ্টি তুলে ধরল কুন্তলের চোখে। কী যেন বলতে গিয়েও পারল না। শুধু ওর বিবর্ণ ঠোঁটের প্রান্তে দুর্বার ভূমিকম্পের সম্ভাবনা সঙ্গোপনের চেষ্টায় ছুটে পালিয়ে গেল ও।

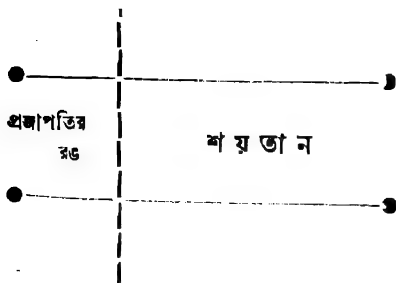
জয়ন্তী হাসুক বা কান্নায় ভেঙে পড়ুক, দুঃখটা সেখানে নয়। আসলে এই বিচিত্র পরাজয় আর হতাশার নিদারুণ পীড়নে অস্থির হয়ে উঠল কুন্তল। শেষ আশাটুকুও মুছে গেল। এরপর চোখ মুছে জয়ন্তী যখন সমুখে এসে দাঁড়াবে, কোন প্রাণে তাকে কয়েকটা মাত্র টাকার কথা বলবে কুন্তল ?

হঠাৎ একান্ত আকস্মিকভাবে ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে চোখের তারা দু'টো জ্বলে উঠল কুন্তলের। রক্তের কোষে কোষে বিচিত্র এক অনু-প্রেরণার উল্লাস থই থই নাচতে লাগল। সোনা! কানবালা! তবে

কি সব বুঝতে পেরে ইচ্ছে ক'রেই আলগোছে ও-টা রেখে গেছে জয়ন্তী কুন্তলের জন্য! একটা উত্তপ্ত লাভাস্রোত ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে উঠল দেহে। অভূতপূর্ব উত্তেজনায় সহসা কানবালাটা মুঠো ক'রে ধরল কুন্তল।

দু-তিনটে গলির বাঁক, ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট অনুজ্জ্বল অন্ধকারের সীমা পার হয়ে, লোকাল ট্রেনের ধোঁয়া-ধূসর বালীগঞ্জের রেল লাইন পেরিয়ে, ট্রামডিপো ছাড়িয়ে একডালিয়া পার্ক বরাবর এসে বাসে উঠল কুন্তল। এখনও সমস্ত দেহ ওর কাঁপছে থরথর ক'রে।

স্যাকরার দোকান থেকে বেরিয়ে আর একবার হাতঘড়ি শূন্য কব্জিটা দেখল, এবং ভাবল, আর ফিরে যাওয়া যায় না। গিয়ে বলা যায় না, তোমার এই রোল্ডগোল্ডের কানবালাটা ফিরিয়ে নাও জয়ন্তী, ফিরিয়ে দাও আমার শেষ সম্বল হাতঘড়িটা। যে-টা তুমি অনেক কৌশলে সরিয়েছ আমার শিয়র থেকে।



পূর্ণমাস কোনো গর্ভবতী মার্জারীর আশু-প্রসব-ব্যাথায় ককানির মতো থেকে থেকে শব্দটা উঠছে। বিষণ্ণ বেদনায় শব্দিত হচ্ছে অবশ ক্লান্ত আধভাঙা কণ্ঠের করুণ আকুতি। আর সেই সঙ্গে গম্ভীর এক কণ্ঠের সচিৎকার শাসন গাঁও-বেতরাইলের নিশুতি রাত্রির শান্ত স্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে ছত্রখান ক'রে দিচ্ছে।

এলংজানির এই বড় বাঁকের দক্ষিণ এলাকাটা ধু ধু শূন্য ফাঁকা। গাছ-গাছালি কিংবা মাটির চিহ্ন নেই। শেষ শ্রাবণের পাকো পাকো আউস ধানের ছড়াগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে থই থই জলরাশির অতলে। চর নেই, মাটি নেই; বাড়ন্ত জলের প্রান্ত ডিঙিয়ে উঁকি দিচ্ছে না এলংজানি পারের কোনো বালিয়াড়ির চুড়ো কিংবা বাড়-বাড়ন্ত কোনো সতেজ ধানগাছের সবুজ অস্তিত্ব।

বাঁয়ে আধডোবা আধজাগা পার। জলডুমুর, হিজল আর ছাইতান গাছের বন। আশ-শ্যাওড়া, মলটে আর ক্যান্দার গাছের ঝোপ-ঝাড়। মাঝে মাঝে ফাঁকা। ধান কিংবা কাস্টিন পাটের আবাদ। রাক্ষুসী এলংজানির থই থই জলরাশির হাত থেকে বাঁচবার জন্য গাঁও-বেত-রাইল যুঝছে। বাঁ-পারের মাটি ধ্বসে ধান পাট কাওনের ক্ষেতে

এলংজানির কুলছাপা পায়ের-পাতা-ডোবা ঘোলাটে জল ছল ছল করছে। নরম হয়ে আসা মাটিতে নুয়ে পড়েছে ধানের ছড়া। আর কোলা মোটা বাড়ন্ত কাওনের ঘন ঘিঞ্জি ছড়াগুলো ছ্যাঙার মতো বীভৎস দেখাচ্ছে।

এতক্ষণ রোশনাই ছিল চাঁদের। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখা যাচ্ছিল মেঘ মেঘ আকাশে। ছায়া নামছিল, রোশনাই জ্বলছিল। আর গাঁও-বেতরাইলের জমি-জিরাত, বন-জঙ্গল কিংবা আবাদী ক্ষেত-খামারে শস্যের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু এখন আলো নেই। রোশনাই মুছে গেছে। দ্বিতীয়ার চাঁদ বিলীন হয়ে বেমালুম মিশে গেছে মেঘ-কালো অন্ধকার আকাশে।

শব্দটা উঠছিল। এলংজানির বাঁ-পার ঘেঁষে ছপ্ ছপ্ জলের শব্দ। ছলাৎ ছলাৎ। যেন বন্যায় আধডোবা কোনো জনপদে এক চিলতে ডাঙার আশায় হতাশ কোনো বন্যচারী জীব মরিয়া হয়ে উঠেছে আশ্রয়ের সন্ধানে।

কিন্তু না, কোনো বন্যচারী জীব নয়। গাঁও-বেতরাইলের আধ-ডোবা আধজাগা পার ঘেঁষে মন্থর স্রোতে এগিয়ে যাচ্ছে একটি ডিঙি নৌকো। পিছ গলুইয়ের ওপর বসে সতর্ক একজন পেশী-পুষ্ট মানুষ প্রাণপণ শক্তিতে বৈঠা টানছে। মন্থর গতিকে তীব্রতর করতে চাইছে আর সেই তাগিদেই ঘন ঘন বৈঠা পড়ছে জলে—ছপ ছপ, ছলাৎ ছলাৎ।

পাটাতনহীন একমাল্লাই ডিঙির ডগরা থেকে একটা আহত কণ্ঠের অব্যয় মূর্ত হচ্ছে। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে একজন বন্দী মানুষ, 'তুমার দুই পান পায়ে পড়তাচি মিঞা, ছাইড়া দ্যাও, ছাইড়া দ্যাও আমারে।'

'চুপ!' গাঁও-বেতরাইলের নির্জন নিস্তব্ধ পারের দিকে একটা চাপা কণ্ঠ গর্জে উঠল। হাতের বৈঠা তুলে ডগরার বন্দী মানুষটির কোমর বরাবর একটা গুঁতো মারল গুঞ্জর আলী, 'শালা কাচিমের ছাও, তরে আইজ্ আমি শ্যাষ করুম; জবাই করুম বেজম্মার পুত।'

নৌকার ডগরার মধ্যে বন্দী মানুষটি আহত জন্তুর মতো আর্তনাদ ক'রে উঠল। সম্ভাব্য আর একটা আঘাত থেকে নিজের দেহকে রক্ষার আশায় ঘোলাটে, কর্দমাক্ত জলে পাক খেল একটা। এবং

দু'এক ঢোঁক জল নাকে মুখে আটকে গিয়ে বিশ্রী বীভৎসভাবে কেঁদে উঠল।

ঢলে ঢলে বর্ষা নেমেছে। কানায় কানায় ভরো ভরো হয়ে সমুদ্দুর হয়ে পড়েছে এলংজানি। গাঁও-বেতরাইলের আধডোবা আধজাগা পার ছাড়িয়ে গোটা দক্ষিণ এলাকাটা জলে জলময়। ধলেশ্বরী আর এলংজানির মধ্যে চর-ছিলামপুরের অস্তিত্ব মুছে গেছে। বিলীন বেপাত্তা হয়ে মিশে গিয়েছে রাক্ষুসী বন্যার গর্ভে।

পাক-খাওয়া ঘোলাটে মন্থর জলস্রোতে আর বৈঠার টানে টানে তীব্র-গতিতে এগুচ্ছিল একমাল্লাই ডিঙিটা। গাঁও-বেতরাইলের পার ঘেঁষে, গাছ-ঝোপের গা-গতর ছুঁয়ে ছুঁয়ে। প্রাণপণে বৈঠা টানছিল গুঞ্জর আলী। আর চাপা ক্রূর গলায় ফুঁসছিল, 'হুঁসিয়ার! চিখ্‌খির মারচস কি বৈঠার গুঁতায় তর চান্দির বান্ধন খুইলা ফেলামু সুমুন্দির পুত।'

অন্ধকার অন্ধকার। ডগরা থেকে উঠে আসা বিষন্ন করুণ আকুতি থেমে গেছে। নিঃশব্দ চুপচাপ এখন। কেবল বন্যার ঘোলাটে পাক-খাওয়া জলের ক্ষীণ শব্দ ছাপিয়ে গুঞ্জর আলীর বলিষ্ঠ থাবায় চাপা পাইয়া কাঠের বৈঠাটা দ্রুত শব্দ তুলছে জলে। তরতর ক'রে সর্পিল গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ডিঙিটা জলকাটা চিতল মাছের মতো। আর সেই সঙ্গে অস্পষ্ট এক ক্ষীণ সুরের মতো শব্দের গমক ছড়িয়ে পড়ছে বন্যাবিধ্বস্ত এই নির্জন এলাকায়।

এতক্ষণে মইষাখালির বাঁওর ঘুরে দক্ষিণমুখো হয়েছে ডিঙিটা। নৌকোর চলনে আর বৈঠার টানে টানে কেমন একটা স্রোতের আভাস পাচ্ছিল গুঞ্জর আলী। আপনা থেকেই তরতর ক'রে এগিয়ে যেতে চাইছিল ডিঙিটা। আর খানিকক্ষণ। মইষাখালির বাঁওর ছাড়িয়ে, মধ্যপাড়ার সীমা ডিঙিয়ে, টেউরিয়া। তারপর? কোমরে হাত দিল গুঞ্জর আলী। হ্যাঁ, পেঁজুরের বাঁখিকাটা খরধার ছেনিটা তৈরীই রয়েছে। আর···গুঞ্জর আলী সেই ডগরার দিকে তাকাল। নিশ্ছিদ্র জমাট অন্ধকারের মধ্যে কাস্টিন পাটের রশি-বাঁধা মানুষটাকে দেখবার চেষ্টা করল। কোনো রকমে একবার ধলেশ্বরীর কিনার। তারপর?

তারপর আর ভাবতে পারছিল না গুঞ্জর আলী। তীব্র একটা পৈশাচিক উত্তেজনায় দেহের শিরা-উপশিরা আর স্নায়ুগুলো চনমন ক'রে উঠছিল।

'আমারে ছাইড়া দ্যাও, ছাইড়া দ্যাও মিঞা।' ডগরার ঘোলা কর্দমাক্ত জলের মধ্য থেকে অস্পষ্ট করুণ কণ্ঠে বন্দী মানুষটির আকুতি শোনা গেল। 'খোদা কসম, তুমার বিবিরে ছাইড়া দিমু। ফিরাইয়া দিমু তুমার কাচে।'

'খবরদার!' হিংস্র পাগলা কুত্তার মতো রুখে উঠল গুঞ্জর আলী। 'তরে না চুপ মাইরা থাইকবার কইচি সুম্মুন্দির পুত্?'

পাইয়া কাঠের বৈঠার একটা সজোর আঘাত খেয়ে ঘোৎ ক'রে শব্দ করল রমজান মোল্লা। হাউ হাউ কান্নার গমক উথলে উঠল তার বেদনাতুর গলায়। 'আমারে বাঁচাও গুঞ্জর মিঞা। বালবাচ্চা পোলাপানগুলার মুখ চাইয়া কসুর মাপ কইরা দ্যাও। জান ভিক্ষা দ্যাও আমার...'

'ভিক্ষা!' হাতের বৈঠা ফেলে কোমর থেকে একটানে খরধার ছেনিটা লহমায় বের ক'রে উর্ধ্বে তুলল গুঞ্জর আলী। 'হারামীর পুত্। জন্মের মতন ভিক্ষা দিমু, খোদার নামে জবাই কইরা গাঙের পানিতে ভাসাইয়া দিমু তরে।'

ক্ষুধার্ত বাঘের মতোই লাফিয়ে পড়ত গুঞ্জর আলী। খরধার ছেনির ফ্যাসে একটা জীবন্ত মানুষের শ্বাস আর কণ্ঠনালী ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলত। কিন্তু পারল না। তীব্র স্রোতে ভেসে আসতে আসতে অতিকায় এক পাকে পড়ে ঘুরপাক খেল নৌকোটা। আর সর্‌সর্‌ ক'রে একটা জলডোবা চড়ায় আটকে গেল সহসা।

টেউরিয়া মুচিপাড়ার প্রান্তে থেমে গেছে নৌকোটা। মাচান বাঁধা দু'একটা ঘরের মধ্য থেকে অস্পষ্ট নক্ষত্রের দ্যুতির মতো প্রকম্পিত আলোর রোশনাই চমকাচ্ছে। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল গুঞ্জর আলী। নিমেষে ট্যাঁকের খাঁজ থেকে সাঁ ক'রে ছেনিটা টেনে বের ক'র ডগরার বন্দী মানুষটির গা বরাবর বাড়িয়ে ধরল। অন্ধকারে

জল জল ক'রে উঠল খেজুরের বাঁধিকাটা ছেনির তীক্ষ্ণ চিক্কন ধার। 'হুঁশিয়ার! ফের রাও করচস কি, ছেনির ফ্যাসে তর ঘেটিখান দুই ফালা কইরা ফেলামু বেজন্মার ছাও।'

উদোম আলগা গা-গতর; গাল গলা মাথা থেকে দর দর ধারায় ঘাম ঝরছে। পৈশাচিক উন্মাদনায় পেশী-পুষ্ট দেহের খাঁজে খাঁজে একটা হিংস্র আক্রোশ ফুলে ফেঁপে তীব্রতর হচ্ছে। বালিবহুল চড়ার কামড় থেকে ডিঙিটাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ শক্তি নিয়োগ করেছে গুঞ্জর আলী।

খস্‌খসে বালি আর মসৃণ নরম থক্‌থকে ছানার মতো পলিমাটি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে ডিঙিটাকে। কামটের মতো তীব্র দাঁত বসিয়ে প্রাণপণে কামড়ে ধরেছে। ঠেলেঠুলে কিছুতেই ডিঙিটাকে সরাতে পারছে না। ভয়ঙ্কর আক্রোশে পা তুলে পিছ-গলুই বরাবর সজোরে একটা লাথি মারল গুঞ্জর আলী।

কিন্তু ডিঙিটা নড়ল না, বিন্দুমাত্র সরলও না। পিছ-গলুইয়ের নিচে কাঁধ লাগিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ঠেলা মারল গুঞ্জর আলী। চোখ বুজে, কপাল কুঁচকে, দম বন্ধ ক'রে প্রাণপণে একটা হ্যাঁচকা ঠেলা। সর্‌সর্ ঘস্‌ঘস্ শব্দ। একমাত্রাই ডিঙিটা নড়ল। এগুলো খানিক। কিন্তু ভাসল না, তরতর ক'রে এগুল না। বরং আবার চড়ার পলিতে আটকে গেল। দাঁড়িয়ে গেল নৌকোটা।

হাঁটুর অনেক নিচে চড়ার জল। ঠেলে ঠেলে ডিঙিটাকে এগিয়ে নিয়ে চলল গুঞ্জর আলী। কতক্ষণ আর, কতদূর এই চড়াটা! এ-বার চড়া ছাড়িয়ে অগাধ জলে ভাসবে ডিঙিটা। তরতর ক'রে ফলি মাছের মতো জল কেটে এগুবে। মধ্যপাড়ার সীমা ছাড়িয়ে খানিকদূর। তারপর ধলেশ্বরীর কিনার। আর মাঝ-ধলেশ্বরী বরাবর পৌঁছেই কাজটা হাসিল ক'রে ফেলবে গুঞ্জর আলী। লোক জন থাকবে না সেখানে, কিংবা কাছাকাছি কোনো জনপদ।

ডিঙি ঠেলতে ঠেলতে গামছার পটি-বাঁধা কোমরে হাত দিল গুঞ্জর আলী। হ্যাঁ, আছে। সকালের শান-দেওয়া খেজুরের বাঁধিকাটা তীক্ষ্ণধার ছেনিটা ঠিক আছে।

সম্ভাব্য ভবিষ্যৎটা চোখের সামনে ভাসছিল। তারপর...তারপর... তারপর গুঞ্জর আলীর চোখের নীল ডিম দু'টোতে স্বপ্নিল ছায়া কথা কয়ে উঠল। জমিলা নামে সেই বেহেস্তের হুরীর উষ্ণ সান্নিধ্যের জন্য ফাকুর-ফুকুর শূন্য বক্ষের অতলে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার পক্ষী ডানা ঝাপটাল।

জমিলা, জমিলা খাতুন। হিঙ্গানগরের ফজল মিঞার ছোট বেটি। গুঞ্জর আলীর চোখের তারায় আর চেতনায় রমণীয় অতীতের খোয়াব ঘন হয়ে এল। চর-ছিলামপুরের হাটে তেজারতির কারবার ছিল ফজল মিঞার। জমি-জিরাত আর দাদনের ব্যবসায় মালামাল হয়ে উঠেছিল অবস্থা। সেই ফজল মিঞার ছোট বেটি জমিলা খাতুনের টানা টানা অতসী ফুল ঘন-পক্ষ চোখ, লাউডগা দীঘল নরম পেলব তনুদেহ, দীর্ঘায়িত ঘন-কৃষ্ণ চুলের গুচ্ছ আর করমচা-লাল ঠোঁটের ফাঁকে শরম-ভীরু হাসির বিচ্ছুরণ গুঞ্জর আলীর চোখের তারা থেকে নিদ্রার আবিলতা ছিঁড়ে-খুঁড়ে নিয়েছিল।

বে-মরশুম পানি হয়েছিল সে বৎসর। আবাদের মাঠে বৃষ্টির ছাঁটে হাঁটু ছুঁই ছুঁই কাস্টিন পাটের পুরুষ্টু চারাগুলো হেলে নুয়ে পড়েছিল। ঘন হয়ে আগাছার জঙ্গল গজিয়েছিল ধান পাট কাওনের ক্ষেতে। কামলা মজুরের টান পড়ল। নিড়ানীর মানুষ নেই। দশ আনা মজুরীর দর উঠল টাকায়। ঘরামির কাজ ছেড়ে নিড়ানী কামলার দলে ভিড়ে পড়ল গুঞ্জর আলী। ফজল মিঞার আবাদী জমিতে খাই-খোরাক আর টাকা টাকা মজুরীতে কাজে লাগল।

সেই কাজ করতে এসে আসমানের বিজলী দেখল গুঞ্জর আলী। অবিশ্রাম খাটুনিতে কাহিল হয়ে পড়েছিল শরীল-গতিক। বেমক্কা বুখারে পাকড়াও করেছিল গুঞ্জর আলীকে। এসেছিল কাঁপন দিয়ে জ্বর।

হুঁশ ছিল না। জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ অবস্থায় দিন কেটে রাত নামল। তীব্র অবসাদ আর বেদনা-জর্জর দেহটায় অবশ ক্লান্তি। কামলার ঘরে একা ককাচ্ছিল গুঞ্জর আলী। আসমানের চান্দের রোশনাই বাখারি জানলার ফোকর দিয়ে ফালি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল ঘরে। ধারে কাছে

কেউ নেই। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি চৌফলা হয়ে আসছে। তৃষিত চাতকের মতো এক ফোঁটা পানির আশায় ছটফট করছিল গুঞ্জর আলী। ক্লান্ত দেহ-টাকে টেনেটুনে বাইরে আসবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওঠা হল না। আচমকা চোখের সামনে একটা রমণীয় খোয়াব দেখল। হ্যাঁ, অন্ধকার ঘরখানা যেন অপূর্ব রোশনাইয়ে আলোকিত হল।

'তুমার পথ্যি লও মিঞা। শটির পথ্যি পাকাইয়া আনচি তুমার লেইগ্যা।' অপূর্ব এক সুরের ঝঙ্কার বেজে উঠল কামলার ঘরের সীমিত পরিধিতে। 'বুখার কমল নি?'

না। কথা কইতে ভুলে গিয়ে মাথা নাড়ল গুঞ্জর আলী। ফজল মিঞার আব্রু-আড়াল অন্দর-মহল থেকে সদ্য বেরিয়ে এসেছে এক আসমান হুরী। নিমেষে বিস্ময়-বিস্ফারিত দু'চোখের কেন্দ্রের নীল ডিম দু'টো পাথর শক্ত হয়ে এল। 'শরীলে বড় দরদ লাগে,' বেদনাতুর গলায় বলল গুঞ্জর আলী, 'মাথাডা কামড়ায়।'

'কামড়ায়!' জমিলা খাতুনের গলায় অপূর্ব দরদ, 'বাড়িতে চইলা যাও, মাথা টিপনের মানুস পাইবা।'

কিন্তু গুঞ্জর আলীর শূন্য ঘরে মাথা টিপনের মানুষ নাই, সে কথাটা বল-বার সুযোগ না দিয়েই জমিলা চলে গেল। আর গুঞ্জর আলী বিষণ্ণ বিহ্বল হয়ে স্থাণুর মতো বসে রইল খড়-বিচালির বিছানায়।

দু'দিন অস্থির জ্বালা নিয়ে কাটল। তৃতীয় দিনে এক পলকের মোলাকাত। জমিলার চোখে অপূর্ব এক হাসির ইসারা দেখল গুঞ্জর। ক'টা রাত খসেখসে গেল উদ্বিগ্নতায়। ঘুম এল না। চোখের পাতায় তন্দ্রার আবিলতা ঘন হয়ে এল না। জ্বালা, বড় জ্বালা।

সপ্তাহ পরেও অসুখের অজুহাতে ঘাপটি মেরে পড়েছিল গুঞ্জর আলী। দিন গিয়ে বিকেল নামল। তারপর সন্ধ্যা। ফজল মিঞার বাড়ির চৌহদ্দিতে দুসরা কোনো মানুষ নেই। নিড়ানির ক্ষেতে জোর কাজের চাপ পড়েছে। সবাই গিয়েছে আবাদে। শুয়ে শুয়ে বাখারি জানলার ফোকর দিয়ে চাঁদ দেখছিল গুঞ্জর আলী। আর অস্থির প্রতীক্ষায় সময় গুনছিল।

এক সময় সেই অস্থির প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। জমিলা নেমে এল গুঞ্জর আলীর সিঁথানে। হাতের শানকিতে শটির পখ্যি। 'তুমারে না বাড়িতে চইলা যাইতে কইছিলাম মিঞা?' চোখে তার হাসির রোসনাই।

'বাড়িতে যামু কার কাচে?' ধড়মড়িয়ে উঠে বসল গুঞ্জর আলী। 'ঘরে আমার মানুষ নাই।'

'নাই?' চোখ তুলে তাকাল জমিলা খাতুন। চার চোখ এক হল সহসা। আর রক্তজবার মতো টুকটুকে শরম ঢেউ খেলে গেল জমিলার চোখে মুখে। কী লাজ, কী লাজ! পখ্যিভরা শানকি নামিয়ে সহসা ছুটে পালাতে গিয়েছিল জমিলা। কিন্তু পারল না। ততক্ষণে আঁচল চেপে ধরেছে গুঞ্জর আলী, 'আল্লার কাচে আরজ করচি তুমার লেইগ্যা—'

লজ্জাবতী কাঁপছিল। মুখ ফিরিয়ে আঁচল চাপা দিয়েছিল শরম-ভীরু মুখের ওপর। দেহের সমস্ত রক্ত বুঝি হু হু ক'রে উঠে আসছিল মুখে।

'মুখ ফিরাও বিবিজান, চাও।' জমিলাকে কাছে টানল গুঞ্জর আলী। 'একটুন চক্ষুটা খুল। আমারে কও বিবিজান, কবে যাইবা আমার ঘরে?'

জানলার অপরিসর ফোকর দিয়ে এক ফালি জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। গুঞ্জর আলীর নিবিড় বাহুবন্ধনের মধ্যে ভীরু পাখির মতো থর থর কাঁপছে জমিলা খাতুন। চিবুক ধরে কাঁপা হাতে মুখটা তুলল গুঞ্জর আলী। কী রূপ, কী রূপ! লাজবন্তীর শরম-নিচু মুখে আর ঠোঁটে করমচা-লাল শরমের রঙ। কানের কাছে মুখ এনে আবেগ-মাখা গলায় বলল গুঞ্জর আলী, 'তুমি আমার বেগম হইবা। কও, যাইবা নি, যাইবা আমার ঘরে?'

জমিলা তাকাল। শরমের আব্রু সরিয়ে ঘন আবিষ্ট চোখে মোলায়েম ক'রে তাকাল। ঠোঁট দু'টি তার কাঁপছে। কথা কইল না জমিলা, আস্তে মাথাটা নুইয়ে দিল গুঞ্জর আলীর বুকে।

ডগরার মধ্যে একটা শব্দ হল। পিছু গলুয়ের নিচ থেকে ছিটকে সরে এল গুঞ্জর আলী। 'খবরদার কুত্তার ছাও! চিল্লাইচস কি…'

'আমারে ছাইড়া দ্যাও মিঞা, জান খয়রাত চাইতাচি তুমার কাচে।'

করুণ কণ্ঠে মিনতি জানাল রমজান মোল্লা। 'খোদা কসম; বাঁচাও আমারে। বাঁচাও।'

'বাঁচামু! হ, বাঁচামু তরে এট্টুন পরে। মাঝ দরিয়ায় যাইবার দে, জন্মের মতন জান খয়রাত দিমু তরে,' ক্রূর, বীভৎস গলায় হেসে উঠল গুঞ্জর আলী। 'শরম নাই? আমারে জেল খাটাইচস শালা ইবলিসের ছাও। কইতরের নাহাল ঘেঁটি ছিড়্যা তরে আমি খোদার দরবারে পাঠামু আইজ।'

দীর্ঘ চড়াটা শেষ হচ্ছিল না। আবার ডিঙিটা ঠেলতে লাগল গুঞ্জর আলী। জলঘাসের বনে সরসর ক'রে এগুচ্ছিল একমাল্লাই ডিঙিটা। আর ধৈর্যের মাত্রাটা ক্রমশ কমে আসছিল গুঞ্জর আলীর। পাশব আক্রোশটা দুরন্ত ঝড়ের মতো ফুঁসছিল। ফুলছিল। কত দূর, কত দূর আর চড়াটা, ধলেশ্বরী আর কত দূর?

আহত জন্তুর মতো ডগরার মধ্যে গোঙাচ্ছিল রমজান মোল্লা। কর্দমাক্ত ডগরার ঘোলাটে জল ছলকে ছলকে নাকে মুখে লাগছিল। মাথা তুলে বার বার দেখতে চেষ্টা করছিল কিছু। হ্যাঁ, গুঞ্জর আলী পিছ-গলুইয়ের নিচে নৌকা ঠেলছে। একটা পাক খেয়ে ধারে চলে এল রমজান মোল্লা। কাস্টিন পাটের শক্ত বাঁধনটার কত শক্তি পরখ ক'রে দেখল। বৈঠাটা ঠেসান দেওয়া রয়েছে পিছ-গলুইয়ে আড়ে। কোনো রকমে একবার যদি বাঁধনটা কেটে যায়, তারপর পাইয়া কাঠের বৈঠাটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরবে রমজান। শরীরের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রিত ক'রে গুঞ্জর আলীর চান্দি বরাবর একটা মাত্র সজোর আঘাত!

কিন্তু না, বড় শক্ত বাঁধন। কাস্টিন পাটের রশিটা কব্জির ওপর বসে গেছে তীব্রভাবে। তবুও বাঁধা হাতটা ডগরার তক্তার সুচিক্কণ ধারালো প্রান্তে সন্তর্পণে রগড়াতে লাগল রমজান। ঘষতে লাগল। ছিঁড়েও যেতে পারে। তক্তার সুচিক্কণ ধারের ঘষটানিতে কেটে যেতে পারে রশিটা। আর তা যদি যায়, মনে মনে বিশ্রী একটা গাল দিল রমজান মোল্লা, 'শালা কুত্তার ছাওরে অর বিবি ফিরাইয়া দিমু, খাওয়াইয়া দিমু গিধুন্নির পুতরে।'

গুঞ্জর আলীর বিবিজান জমিলাকে যে দিন দেখেছিল রমজান, তীব্র একটা নেশার ঘোর টনটনিয়ে উঠেছিল রক্তে। বুকের কোথায় যেন একটা অস্থির কামনা উথল-পাথল করছিল। মেহেদী রঙের নুরে মোলায়েম ক'রে হাত বুলোতে বুলোতে গুঞ্জর আলীকে বলেছিল, 'বিবিখান তো জব্বর হইচে মিঞ্যা।'

'হ।' তামাক সাজতে সাজতে তালুকদার রমজান মোল্লার দিকে তাকাল গুঞ্জর, 'হিঙ্গানগরের ফজল মিঞার বেটি।'

'তাই কও।' ঢোঁক গিলল রমজান মোল্লা। 'ভাল জাইতের চাড়া। খুবসুরত্ সোন্দর জাইতের মাইয়া।' নুরে হাত বুলোতে বুলোতে সোলার বেড়ার ফাঁক দিয়ে একচক্ষু দৃষ্টিটা অন্দরে চালিয়ে দিল রমজান। দিলবাগে তরঙ্গ তোলা নারীতনুর প্রত্যাশায় নেড়ি কুত্তার চোখের মতো কুৎকুতে চোখ দু'টো চকচক ক'রে উঠল।

ফুসলিয়েই নিতে চেয়েছিল রমজান, কিন্তু জাত-কেউটের ছাও কিছুতেই মাথা নামায় না; কায়দা করা গেল না হারামীর বেটিকে। অবশেষে গুঞ্জর আলীকে গঞ্জের ঘাটে পাঠাল রমজান। আর রাতারাতি দলবল চড়াও ক'রে, গামছার পট্টিতে মুখ বেঁধে আসমানী কন্যাকে নিয়ে উধাও হল। আব্রু-আড়াল অন্দরমহলে বন্দী করল জমিলা বিবিকে।

দু'দিন পর গঞ্জের ঘাট থেকে ফিরে এল গুঞ্জর আলী। সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। অন্ধকার নেমেছে ঘন হয়ে। আর সেই কঠিন অন্ধকারের মধ্যে প্রেতদেহের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে নিষ্প্রদীপ দোচালা ঘরটা। ছ্যাৎ ছ্যাৎ ক'রে বুকের কোথায় যেন ছোঁক ছোঁক তপ্ত শিখা জ্বলে উঠল। সজারু কাঁটার মতো টান টান দাঁড়িয়ে গেল লোমগুলো। ত্রস্তে করমচা ঝোপের কাছে সরে এসে ভীরু গলায় ডাকল গুঞ্জর আলী, 'জমিলা, জমিলা…'

উত্তর এল না। নিষ্প্রদীপ দোচালা ঘরের মধ্যে শব্দ ক'রে বাতি জ্বলল না। শুধু নিথর নিঃশব্দ আঙিনায় থোক থোক জোনাকির দল টিপ টিপ ক'রে জ্বলল আর নিভল।

অস্থির উত্তেজনায় কাঁপা হাতে বাঁশ-চাটাইয়ের দরজাটা. তীব্র মুঠিতে চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল গুঞ্জর আলী। শব্দ ক'রে হা হয়ে গেল দরজাটা। আর ঘরের নিশ্ছিদ্র গুমোট অন্ধকারের একটা ঝাপটা আচমকা এসে লাগল মুখে চোখে।

'জমিলা···,' চিৎকার ক'রে ডাকল গুঞ্জর আলী। গমগমে সেই কণ্ঠ বাঁশঝোপ, হিজল আর মলটের জঙ্গলে শব্দিত হয়ে মিলিয়ে গেল। কিন্তু জমিলা এল না। সোহাগ-কাঁপা গলায় হাসির তরঙ্গ তুলে ছুটে এল না সেই যৌবনবতী।

কেউ বলল না। কেউ দিশা হদিশ দিল না। কিন্তু গুঞ্জর আলী জানত কোথায় আছে সেই বেপাত্তা বেগম-বিবি জমিলা খাতুন। ছিনিয়েই আনতে গিয়েছিল গুঞ্জর আলী। তীক্ষ্ণধার একটা বল্লম নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল রমজান মোল্লার অন্দরমহলে। কিন্তু নসিবের কি খেল, বেদরদ খোদা-তায়ালার কি কুটিল চক্রান্ত—যার জন্য সেই নিশুতি রাত্রির অন্ধকারেও ধরা পড়ে গেল। লোকজন নিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে গুঞ্জর আলীকে বেঁধে ফেলেছিল রমজান মোল্লা। খবর দিয়েছিল থানায়। আর চুরি, রাহাজানির অপরাধে আড়াই বৎসর জেল ভোগ করতে হয়েছিল গুঞ্জর আলীকে।

টেউরিয়া গুটিপাড়া পেছনে পড়ে রইল, জলঘাসের ঘন ঘিঞ্জি বন বুঝি শেষ। গুঞ্জর আলীর চোখের তারায় অস্থির জোনাকি-আলো দপ্ দপ্ করছে। বাঁয়ে চোখ ফেরাল গুঞ্জর আলী। জল আর জল। চর গাঁওহীন দিগন্তব্যাপী ধু ধু এলাকা। ডাইনে আদিগন্ত জলরাশি। আর সামনে, সামনে ধলেশ্বরী।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। এক ঝলক আলো ঠিকরে পড়ল, মিলিয়ে গেল হঠাৎ। আর সহসা চাপ চাপ অন্ধকার দৃষ্টিরোধী কুয়াশার মতো রূপে দাঁড়াল। আবার, আবার বিজলী চমক। আর সেই চমকে চমকে জলা রোশনাইয়ে দূরের ধলেশ্বরীকে দেখতে পেল গুঞ্জর আলী। কানে শুনতে পেল অশান্ত জল-কল্লোল।